বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন সাংবাদিকতা

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

“

বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন সাংবাদিকতা– এমন একটি প্রয়াস, যা দেখে মনে হয়, গণমাধ্যমকর্মীদের উচ্চমানসম্পন্ন করে গড়ে তোলাই এর অন্যতম লক্ষ্য। পনেরোটি অধ্যায়ে নির্বাচনের প্রায় সকল বিষয় অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে-কোনো গণমাধ্যমকর্মীকে গভীরতম জ্ঞানের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বইটি। এখানে আলোচিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করতে পারলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা তথা নির্বাচন সাংবাদিকতা এবং পেশাদারিত্বের নিবিড় চর্চা করা হবে।

”

ড. মো. গোলাম রহমান
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ও

সাবেক অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন সাংবাদিকতা

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

British
High Commission
Dhaka

MRDI

UKaid
from the British people

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশে মুদ্রিত

অলংকরণ ও মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

সূচিপত্র

ভূমিকা		৫
প্রসঙ্গ-কথা		৭
অধ্যায় ১	গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও নির্বাচন	৯
অধ্যায় ২	জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণমাধ্যম পরিস্থিতি	১৭
অধ্যায় ৩	নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান	২৩
অধ্যায় ৪	নির্বাচন রিপোর্টিং : আদর্শ সাংবাদিকতার মূলনীতিসমূহ	৩১
অধ্যায় ৫	নির্বাচন রিপোর্টিং : সূত্র ও কৌশল	৪৯
অধ্যায় ৬	নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি	৫৭
অধ্যায় ৭	প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিং	৬৫
অধ্যায় ৮	নির্বাচনকালীন রিপোর্টিং	৭৭
অধ্যায় ৯	নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজ/রিপোর্টিং	১০৯
অধ্যায় ১০	নির্বাচনী সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলন	১১৩
অধ্যায় ১১	টেলিভিশনে নির্বাচন সাংবাদিকতা	১২৫
অধ্যায় ১২	নির্বাচনী জরিপ/জনমত জরিপ	১৩৩
অধ্যায় ১৩	নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সামাজিক গণমাধ্যম ও ফেক নিউজ	১৪১
অধ্যায় ১৪	নির্বাচনে জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিং	১৫৯
অধ্যায় ১৫	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি	১৬৩
তথ্যসূত্র		১৭৫
সংযোজনী-১		১৮২

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় আয়োজন হলো নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। একটি জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে গণমাধ্যমের দায়িত্ব অনেক। রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করে গণমাধ্যম সুষ্ঠু নির্বাচনের পথকে গতিশীল করে। আবার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলতে শুধু পর্যাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে ভোট দেয়াকে বোঝায় না। বরং ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ গণমাধ্যম একদিকে যেমন তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবে অন্যদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিশ্চিত হতে হবে। এ দুয়ের সুষ্ঠু সম্মিলন ছাড়া অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণা স্বপ্নই থেকে যাবে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব ও অধিকারবোধ নিয়েই এ বইয়ের পরিধি। এখানে মূলত বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা কীভাবে নির্বাচন রিপোর্টিং করবেন, তাঁদের কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, কীভাবে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন ঘটে, আদর্শ সাংবাদিকতার মানদণ্ডগুলো কীভাবে অনুসরণ করা যায় সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবতার নিরিখে আলোচনার জন্য ২০০৮ ও ২০১৪ সালের দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংবাদপত্র এবং টিভিতে প্রকাশিত ও প্রচারিত খবরের আধেয় বিশ্লেষণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ও উদাহরণের ভিত্তিতে এবং নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের কর্মপরিধির আলোকে এ বইটির আধেয় সাজানো হয়েছে। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নির্বাচনসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে এই বইটি সামান্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইটি রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইটির পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেছেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান। তাঁর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। নির্বাচনী আইন ও বিধি বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলী। অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি।

বইটির খসড়া পাণ্ডুলিপির ওপর মূল্যবান বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জিটিভি এবং সারাবাংলা. নেট-এর প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, দেশ টিভির সম্পাদক, সুকান্ত গুপ্ত অলক, ইনডিপেনডেন্ট টিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক আশিস সৈকত, ইউএনবির নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ, নিউজ২৪-এর প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুন্নী এবং দৈনিক *প্রথম আলো*র উপ-সম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছির প্রতি।

বইটির জন্য পরিচালিত গবেষণাকর্মে এবং এ প্রকাশনায় জড়িত এমআরডিআই-এর সকল কর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের আর্থিক অনুদান এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত 'ক্যাপাবল মিডিয়া ফর স্ট্রং ডেমোক্রেসি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বইটি প্রকাশিত হলো। ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই বইয়ে প্রকাশিত মন্তব্য ও তথ্য ব্রিটিশ হাইকমিশন, ব্রিটিশ সরকার কিংবা দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এ মতামতের প্রতিফলন নয়।

প্রসঙ্গ-কথা

সমাজের নানা শ্রেণি, পেশার মানুষের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও তথ্যসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকারের ওপরই গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটা আধুনিক যুগে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত জনপরিসরের কলেবর বাড়িয়ে রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তোলে। এ কারণে জাতীয় সংসদ বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে গণমাধ্যম ও সাংবাদিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একদিকে খবর প্রকাশ করে অন্যদিকে সমাজের নানামুখী মত তুলে ধরে গণমাধ্যম শাসনপ্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলে। গণমাধ্যম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী, দল ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে। নির্বাচনী প্রচারের সময় জনস্বার্থের বিষয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে সাংবাদিকরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ভঙ্গুর বা বিকাশমান গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। এসব দেশে নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সাংবাদিকের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করার জন্য তাঁদের কিছু অধিকারের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের দায়িত্ব যেমন আছে তেমনি সে দায়িত্ব পালনের জন্য অধিকারও আছে। সে অধিকার হলো কোনো ধরনের চাপ বা হুমকি ছাড়া তাঁরা তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন। আর দায়িত্ব হলো সঠিক, নির্ভুল, শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরবেন। এ কাজটি সহজ নয়। বিভিন্ন ধরনের বাধা ও ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে তাঁদের এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশ্বব্যাপী দেখা গেছে, নির্বাচনের সময় সাংবাদিকরা নানা দিক থেকে চাপ ও হয়রানির সম্মুখীন হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা দলীয় বার্তা ও প্রচারণার নিছক বাহক হয়ে যান।

সাংবাদিকতা পেশা বিশ্বব্যাপী কমবেশি একই রকম কিছু আচরণবিধি ও সর্বজনীন নৈতিকতার মূলনীতির ওপর পরিচালিত হয়। এই গ্রন্থটি সাদামাটাভাবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়নি অথবা এখানে শুধু তত্ত্বকথাই তুলে ধরা হয়নি। বরং তত্ত্বকথাগুলোকে বাস্তবতার ছাঁচে ফেলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যক্ষমতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির নতুন ও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, আমাদের দেশে নির্বাচন রিপোর্টিং নিয়ে যে কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো মূলত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে লেখা। অর্থাৎ এসব পুস্তকে একটি আদর্শ নির্বাচন রিপোর্টিং কেমন হওয়া উচিত সে ধারণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নির্বাচন রিপোর্টিং কেমন হচ্ছে অথবা কেমন ধরনের নির্বাচন রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক কোনো গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সে উপাত্তের ভিত্তিতে সাংবাদিকদের জন্য কোনো ধরনের নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা পূর্বেকার বইগুলোতে দেয়ার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এই গ্রন্থটিতে বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি জাতীয় দৈনিক ও ছয়টি টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত খবরের আধেয় বিশ্লেষণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাপদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে সুনির্দিষ্ট কেসগুলোকে উদাহরণ হিসেবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বইয়ে নতুন ও সাম্প্রতিক কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন– নির্বাচনী জনমত জরিপ, ভোটার কণ্ঠস্বর রিপোর্টিং, সামাজিক গণমাধ্যম ও ফেক নিউজ ইত্যাদি। তৃতীয়ত, গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন রিপোর্টিং করতে গিয়ে সাংবাদিকদের জন্য পালনীয় একটি আচরণবিধি এই বইয়ের শেষে তুলে ধরা হয়েছে। এই আচরণবিধি স্বতঃসিদ্ধ কোনো বিষয় নয়। এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে। এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মানদণ্ড রক্ষার্থে সাংবাদিকদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া। কারণ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ছাড়া ভোটার, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের অধিকার সুরক্ষিত হতে পারে না। সর্বোপরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই।

সাংবাদিকদের নৈপুণ্যের বিকাশ এক দিনে হয় না। এজন্য দরকার নিয়মিত চর্চা আর সুবিবেচনাপ্রসূত পেশাদার সংবেদনশীলতা। এই দুটি ক্ষেত্রে এই বইটি একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। সব ধরনের গণমাধ্যম এবং সব পর্যায়ের সাংবাদিকদের (স্থানীয় ও জাতীয়) জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। নির্বাচনকালীন উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর প্রায়োগিক উত্তর আর বাস্তব উদাহরণসমৃদ্ধ হওয়ায় এ বইটি নির্বাচন বিটের সাংবাদিকদের জন্য টুলবক্স বা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি। আর যদি করতে সক্ষম হয়, তাহলে এই বইটি গণতন্ত্রের চর্চাকে শক্তিশালী করতেও ভূমিকা রাখবে।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যায় ১

এ অধ্যায়ে থাকছে

গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও নির্বাচন

- গণতন্ত্র ও নির্বাচন
- নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো
- গণমাধ্যম ও নির্বাচন
- গণমাধ্যমের ভূমিকা

গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও নির্বাচন

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

গণতন্ত্রের ইংরেজি 'democracy' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'demokratia' থেকে এসেছে। এর দুটি অংশ– 'demos' অর্থ জনগণ অন্যটি 'kratos' অর্থ শাসন বা শক্তি। অর্থাৎ গণতন্ত্র কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোতে সরাসরি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। এই রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা কম হওয়ায় প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব ছিল। কালের পরিক্রমায় এ ধরনের রাষ্ট্র আজ বিলুপ্ত। এ নিয়ে ইউরোপসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় – একটি রাজনৈতিক দর্শন, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ভাবা হয়। এ ধরনের গণতন্ত্রকে বলা হয় পরোক্ষ গণতন্ত্র। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচন হচ্ছে একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আয়োজন হচ্ছে নির্বাচন। এর মধ্য দিয়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সব নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালনায় সমান অধিকার ভোগ করে। এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোট দেয়া নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ও নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদে – মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূলনীতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই গণতন্ত্র শক্তিশালী এবং গণতান্ত্রিক ধারার অগ্রগতির জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন অত্যাবশ্যকীয় – *The founding pillars of any democratic political system, whether considered fragile or established, remain undoubtedly elections which can simply be taken as the most critical and visible means through which all citizens can peacefully choose or remove their leaders, and which are evidently costly affairs.* (Anglin, 1998, p. 474)।

নির্বাচন হলো একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাঁর হাতে শাসনভার তুলে দেয়। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উপায় হিসেবে নির্বাচন সর্বজনীন উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে মানুষ তাদের প্রতিনিধিকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ সুগম হয় এবং সত্যিকারের

গণতন্ত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। গণতন্ত্র মানেই জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন, জনগণের সম্মতির শাসন। শুধু তা-ই নয়, নির্বাচনই একমাত্র প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীও জনগণের ইচ্ছার প্রতি কর্ণপাত করতে বাধ্য হয় – *Elections are the principal instruments that compel or encourage the policy-makers to pay attention to citizens.* (Powell, 2000, p. 4)।

নির্বাচনব্যবস্থার ধারণা বহু পুরোনো। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিস ও রোমে নির্বাচনের ব্যবহার হয়ে আসছে। এ ছাড়া মধ্যযুগে রোমান সম্রাট এবং পোপ বাছাই করতেও নির্বাচন আয়োজন করা হতো। ভারতবর্ষে ও বহু আগে থেকেই নির্বাচনের ব্যবহার হয়ে আসছে। আর বাংলায় মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পাল রাজার মধ্যে গোপালকে বাছাই করতে নির্বাচন আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সপ্তদশ শতকের আগে উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারব্যবস্থা না থাকায় নির্বাচনব্যবস্থা পরিচিত ছিল না। অবার সপ্তদশ দশকের প্রথম দিকে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রভাবশালী পুরুষরা শুধু ভোট দিতে পারতেন। ১৯২০ সালের পরে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থী ও দল বাছাই করতে পারে, তুলে দিতে পারে দেশের শাসনভার। একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব পছন্দের প্রার্থী বাছাই ও বর্জনের সুযোগ থাকে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের ২১ অনুচ্ছেদে এ অধিকার স্বীকৃত। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২১ নম্বর ধারার ১ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> (১) প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।
>
> (৩) জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসনক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোনো অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

একই ধরনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৫ ধারায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, অবাধ এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ভোটারদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এবং দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই সেই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সঠিক বলা যায়। নির্বাচনও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হলো : দেশের যেসব নাগরিক প্রার্থী হতে আগ্রহী তাঁরা প্রার্থী হতে পারেন; ভোটারের সামনে অনেক বিকল্প প্রার্থী থাকবে এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে; ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে

এবং স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন; ভোটদান প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হবে; নির্বাচনটি ভোটার এবং দেশীয়-আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

গণমাধ্যম ও নির্বাচন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতায় গণতন্ত্রকে বলেছেন জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার। গণতন্ত্রের এমন সহজ, স্বাভাবিক ও সরল সংজ্ঞা দেয়া গেলেও একটি দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তা নিরূপণ করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। গণতন্ত্রকে যদি একটি মহাসড়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সে সড়কটি কোনোভাবেই মসৃণ নয় বরং এ পথটি অনেক আঁকাবাঁকা। তবে এই আঁকাবাঁকা পথ মাড়িয়ে গণতন্ত্রকে মসৃণ পথে আনতে হলে রাষ্ট্রকে তার জনগণের কাছে শতভাগ জবাবদিহি থাকতে হয়। সে কারণেই গণতন্ত্র শব্দটি রাষ্ট্রের গুণগত বিষয়। এই গুণটি রাষ্ট্রে কতটা বিদ্যমান থাকবে তা নির্ভর করে কয়েকটি চলকের ওপর। এর মধ্যে সবার প্রথম ও প্রধান চলকটি হলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

গণতন্ত্র প্রবর্তন বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাপক। রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করে গণমাধ্যম। গণতন্ত্রের সুফল সাধারণ জনগণ তখনই ভোগ করবে যখন ওই রাষ্ট্রে বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে এবং গণমাধ্যম স্বাধীন হবে। গণতন্ত্রকে একটি মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়ে থাকে যেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সম্মান, সুষ্ঠু নির্বাচন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য নির্বাচনকালীন একটি টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম।

সমাজ, রাজনীতি ও শাসনের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। উন্নয়নশীল গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রভাব আরও বেশি। যে-কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান যুগে আমাদের চারপাশ জুড়ে আছে গণমাধ্যম। আমরা প্রতিনিয়ত টিভি দেখছি, রেডিও শুনছি, বই, ম্যাগাজিন কিংবা সংবাদপত্র পড়ছি কিংবা প্রতিনিয়ত বিচরণ করছি সামাজিক গণমাধ্যমে। গণমাধ্যম ছাড়া মানুষ সমাজে একাকিত্বের জালে আটকা পড়ে। শুধু বহির্বিশ্ব থেকে নয়, বরং নিজের সরকার, পরিবেশ ও প্রতিবেশী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কমিউনিটি ও সমাজের উন্নয়নের জন্য দরকার তথ্যের প্রবাহ, যা সরবরাহ করে গণমাধ্যম। অবাধ তথ্যপ্রবাহ ছাড়া মানুষের মতামত সীমিত হয়ে পড়ে এবং জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা হয়ে পড়ে স্থবির। ষাটের দশকের 'বিশ্ব গ্রামের' ধারণাটি তাই এখনও কার্যকরী।

স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া যে-কোনো গণতন্ত্র অসম্ভব। গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা উপলব্ধি করার জন্য আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের একটি কথা বেশ প্রণিধানযোগ্য। গণতন্ত্রের মুখপাত্র হিসেবে খ্যাত জেফারসন একবার বলেছিলেন, সংবাদপত্র ছাড়া সরকার আর সরকার ছাড়া সংবাদপত্র – এ দুয়ের মধ্যে যদি তাঁকে কোনো একটি বেছে নিতে হয়, তাহলে তিনি শেষটিই বেছে নেবেন। এটাকে জেফারসনের ঘোষণাও বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যম গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। কারণ গণমাধ্যম যে ধরনের তথ্য দেয় তার ওপর ভিত্তি করে ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেন। গণমাধ্যম সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরে। খারাপ কাজগুলোকে চিহ্নিত করে প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। গণমাধ্যম তথ্য প্রদান, শিক্ষিত করা এবং প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে দিয়ে শাসনমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরেই মতপ্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে-কোনো উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অংশে ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে – '(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।' এর অর্থ হলো সাংবাদিকদের সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া তথ্য খোঁজা, পাওয়া ও সে তথ্য জনগণকে জানানোর অধিকার আছে। সরকারি কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনকালে কোনো ধরনের হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বাধা দিতে পারবে না। আইনের ব্যত্যয় না ঘটলে সরকার সাংবাদিকদের ওপর কোনো ধরনের সেন্সরশিপ আরোপ করতে পারে না। এ অধিকার মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ মানুষ কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া যে-কোনো তথ্য খুঁজতে পারবে, গ্রহণ ও প্রদান করতে পারবে।

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে শুধু পর্যাপ্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোট দিতে পারাকে বোঝায় না। বরং দেশের নাগরিকরা যাতে নিজেদের পছন্দের প্রার্থী ও দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবকিছু জেনে-বুঝে দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে কারণে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের অবাধ তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও থাকতে হয়। এজন্য একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মূলনীতি হলো দুটি :

১. নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হবে।

২. নির্বাচনে গণমাধ্যম তিনটি ভূমিকা পালন করতে পারবে : তথ্য জানানো, প্রহরীর ভূমিকা এবং ভোটারদের কণ্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা পালন।

একটি নির্বাচন দেশের মানুষের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ামক। এর ফলাফল নির্ভর করে নির্বাচনী প্রচার ও ভোট সম্পর্কে গণমাধ্যম কীভাবে খবর প্রচার/প্রকাশ করছে তার ওপর। সে কারণে গণমাধ্যমকে দল-মতনির্বিশেষে নিরপেক্ষ রিপোর্ট করতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী একই ধরনের – তথ্য জানানো, শিক্ষিত করা, জনগণের হয়ে প্রহরীর ভূমিকা পালন করা, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় সরকারি ও

বেসরকারি খাতের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সমাজের ঘটনা ও ইস্যুগুলো নিয়ে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। এগুলো একটি স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমের আবশ্যকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আধুনিক যুগে অলীক স্বপ্নই বটে। বরং বলা যায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো গণমাধ্যম। মার্কিন রাজনীতিবিদ রজাস স্টোন বলেছেন, '*The general election is not an organizational exercise – it's a mass media exercise.*' গণমাধ্যম যদি স্বাধীনভাবে প্রত্যেক প্রার্থী ও দল সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরতে না পারে, তাহলে জনগণের পক্ষে তথ্য জানা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বিবদমান দল ও প্রার্থীদের মধ্যকার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় না। ভোটার নিবন্ধন থেকে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের সাহায্যেই একমাত্র দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে একই ধরনের তথ্য পৌছানো সম্ভব। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে প্রহরীর দায়িত্ব গণমাধ্যম পালন না করলে কোনোভাবেই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। বর্তমানে রাজনীতিবিদ ও ভোটার উভয়েই গণমাধ্যমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। আবার সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সম-সম্পর্ক থাকে। কারণ উভয়ের লক্ষ্য জনগণকে তথ্য জানানো – *Politicians cannot succeed without access to the media, just as reporters cannot succeed without access to political leaders.* (Swanson 1992, 399)।

গণমাধ্যম সরকারি ও বিরোধী দল উভয়কে বিগত সময়ে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করে। সরকার বিগত সময়ে কেমনভাবে দেশ চালিয়েছে এবং বিরোধী দল গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে কতটা ভূমিকা রেখেছে তা গণমাধ্যমের সাহায্যেই দেশের মানুষ জানতে পারে। সরকার ও বিরোধী দলকে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর জন্য গণমাধ্যম প্রশ্নের মুখোমুখি করে। এসব কারণে একটি মুক্ত, স্বাধীন গণমাধ্যমের সঙ্গে গণমাধ্যমের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এরা একে অন্যের পরিপূরক। একটি মুক্ত গণমাধ্যম নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক করে। অন্যদিকে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করে।

গণমাধ্যমের ভূমিকা

একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে গণমাধ্যম চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে :

১. প্রথমত, গণমাধ্যম জনগণকে নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য জানায়।

জনগণের সচেতনতার ওপরই একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভরশীল। এ সচেতনতা আসে যখন ভোটার হওয়া, ভোট প্রদান, প্রার্থী ও দল তথা সামগ্রিক অর্থে পুরো নির্বাচন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের কাছে ব্যাপক তথ্য থাকে। গণমাধ্যম যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া প্রতিবেদন বা রিপোর্ট প্রচার/প্রকাশ করে, তাহলে ভোটাররা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। গণমাধ্যম প্রাবন্ধিক, বিশ্লেষকদের কলাম কিংবা টক-শোর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তুলে ধরে। গণমাধ্যম নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে

বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য প্রচার করে, যেমন – প্রার্থী কে, কোথায় ভোট দিতে হবে, কীভাবে গোপনে ভোট দিতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রচার/প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে জনসমর্থন চেয়ে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়। ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে যেসব তথ্য অবশ্যই গণমাধ্যমকে তার পাঠক/দর্শককে জানাতে হয় সেগুলো হলো :

- কে ভোট দিতে পারবে আর কে পারবে না?
- কোথায়, কখন ও কীভাবে নাগরিকরা ভোটার নিবন্ধন করতে পারবেন?
- কোথায়, কখন ও কীভাবে নাগরিকরা ভোট দিতে পারবেন?
- এটি কী ধরনের নির্বাচন (সংসদীয়, স্থানীয় সরকার)?
- প্রার্থীদের কীভাবে নির্বাচিত করা যাবে এবং নির্বাচিত প্রার্থীরা কি ক্ষমতা পাবেন?

২. দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী প্রচার ও ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যম প্রহরীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমানে রাজনীতি ও সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটাকে গণমাধ্যমের প্রহরীর ভূমিকা বলা হয়। যদি কোনো প্রার্থী, ভোটার কথা বলতে ভয় পায় কিংবা নির্বাচন ও ভোটিং প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়েছে – গণমাধ্যমের এমন প্রতিবেদনের অর্থ হলো নির্বাচন কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। ভোটারদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া, রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি, নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর যথেচ্ছারসহ যে-কোনো ধরনের কারচুপির বিরুদ্ধে গণমাধ্যম জনগণের প্রতিনিধি হয়ে প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্তগুলো পালিত হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব গণমাধ্যমের।

৩. তৃতীয়ত, গণমাধ্যম প্রচারের প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করে।

প্রার্থী ও দলগুলো নিজেদের পরিচিতি, রাজনৈতিক কর্মসূচি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানানোর পূর্ণাঙ্গ অধিকার আছে। এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীর গণমাধ্যম ব্যবহারের অধিকার ও সমান সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রার্থী ও দলগুলোর প্রচারকাজের প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করে জনগণকে তথ্য জানায়। জনগণ এসব তথ্যের ভিত্তিতে তাদের পছন্দের প্রার্থী ও দল খুঁজে নেয়। এক্ষেত্রে একটি নির্বাচন কভার করতে গণমাধ্যম কর্মীদের লেভেল প্লেয়িং বা সবার জন্য সমান সুযোগ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হয়। এতে সংবাদের ভারসাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

৪. চতুর্থত, গণমাধ্যমকে ভোটারদের কণ্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়।

নির্বাচন শুধু রাজনীতিবিদদের জন্য নয়। একটি নির্বাচন সাধারণ জনগণের জন্যও কথা বলার সুযোগ করে দেয়। এ সময় তারা বলতে পারে কোন ইস্যুগুলো তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন। গণমাধ্যমকে কমিউনিটির কাছে যেতে হবে এবং সাধারণ মানুষের

কাছে তাদের কথাগুলো প্রচার/প্রকাশ করতে হবে এবং সেসব মানুষের কণ্ঠস্বর হতে হবে যারা অতীতে কথা বলতে পারেনি বা যাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে। নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমকর্মীদের জনগণকে জানাতে হবে নির্বাচনের আদ্যোপান্ত। কেননা দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে যাবতীয় তথ্য জানার। আর সে অধিকার বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

ওপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, নির্বাচনে ভোটার, রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমের মধ্যকার সম্পর্ক হবে পরিপূরক। বিষয়টিকে আমরা একটি মিথস্ক্রিয় মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি যেখানে কেউ তথ্যের একক নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে না। বরং নির্বাচনের তিনটি অনুঘটক – জনগণ, রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যম প্রত্যেকেই সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। এজন্য এদের মধ্যকার পারস্পরিক ত্রিমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে একে অন্যের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান হয়। এই ত্রিমুখী সম্পর্ক যতটা বিস্তৃত হবে ততই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। এ মডেল অনুযায়ী গণমাধ্যম মিডিওকারের ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ গণমাধ্যম জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য রাজনীতিবিদদের কাছে এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরবে। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো সেন্সরশিপ আরোপ করবে না।

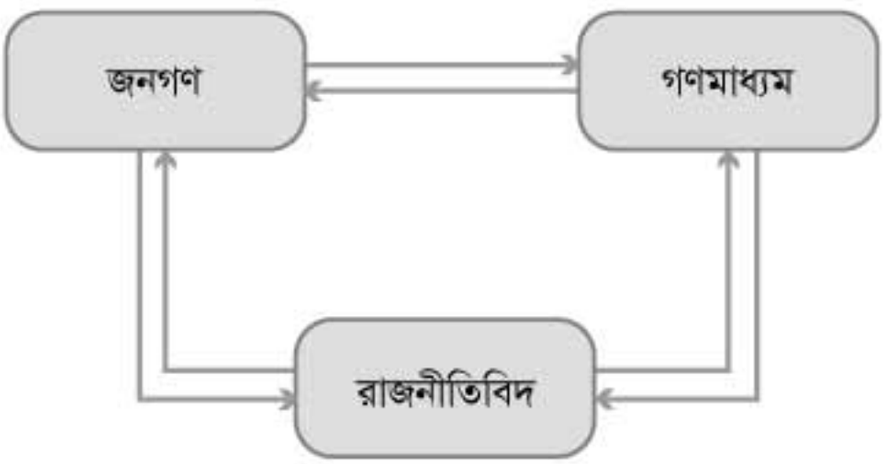

অধ্যায় ২

এ অধ্যায়ে থাকছে

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণমাধ্যম পরিস্থিতি

- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস
- বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণমাধ্যম পরিস্থিতি

নির্বাচন হলো জনসমর্থন আর ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ। সে কারণে কোনো দেশের নির্বাচন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার আগে দেশটির জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাস এবং গণমাধ্যম পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইনসভার নাম **জাতীয় সংসদ** (বাংলায়), ইংরেজিতে বলা হয় – House of the Nation। জাতীয় সংসদ একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যার সদস্য সংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে ৩০০টি নির্ধারিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন। আইনানুযায়ী জাতীয় সংসদে দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে নারী সদস্যরা সংসদের মেয়াদকালের সময়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন।

সংবিধানের ৭২(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর। সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্তই একটি সংসদের মেয়াদ থাকে। তবে রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে সংসদ বাতিল করে দিয়ে নির্বাচন দিতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী, শুধু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে এ বর্ধিত মেয়াদ কোনোভাবেই এক বছরের বেশি হবে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস

ব্রিটিশ সংসদ থেকে বাংলার মাটিতে জাতীয় সংসদের ধারণাটি আসে। ১৮৬১ সালে গঠিত হয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব বেঙ্গল (Ahmed, 2001)। এরপর ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালে তিন দফা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সংশোধনের পর ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়। ২৫০ জন সদস্য নিয়ে এর প্রথম অধিবেশন শুরু হয় কলকাতায় ১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান

থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০০ জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৪৬৯ জন সদস্যের সমন্বয় প্রভিশনাল কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকার তেজগাঁওয়ের সংসদ ভবনে শুরু হয়। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন জনাব শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে। এই সংসদে ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় আর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। মোট ৫৪.৯ শতাংশ ভোটার এ নির্বাচনে ভোট দেয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ঢাকা তেজগাঁওয়ের জাতীয় সংসদ ভবনে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল।

২য় থেকে ৪র্থ – এই তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সামরিক সরকারের অধীনে (Firoj, 2013, p. 85)। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের ২য় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২য় জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ১৫টি থেকে ৩০টিতে উন্নীত করা হয়। এতে সংসদের মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩০ জনে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৭টি আসন পায় আর আওয়ামী লীগ পায় ৩৯টি। ২ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ২য় জাতীয় সংসদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ আসন থেকে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন সৈয়েদা রাজিয়া হাফেজ।

৭ মে ১৯৮৬ সালে ৩য় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে, আওয়ামী লীগ পায় ৭৬টি আসন। বিএনপি এ নির্বাচনে অংশ নেয়নি।

৪র্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩ মার্চ ১৯৮৮ সালে। এ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি অংশ নেয়নি। ৭৬টি অখ্যাত রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত দুর্বল ও অনুগত নির্বাচনী জোট 'সম্মিলিত বিরোধী দল' ১৯টি আসন লাভ করে (Gain, 2006, p. 179)।

৫ম ও ৭ম থেকে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে রেকর্ডসংখ্যক ৭৬টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৪০টি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন লাভ করে।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চের মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের পর থেকে এ সংকট

আরও তীব্র হয়। পরের পাঁচটি উপনির্বাচন বয়কট করে বিরোধী দলগুলো। বিরোধী দলগুলো একযোগে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। শূন্য হওয়া ১৪৭টি আসনে বন্যার কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন (Gain, 2006, p. 189)। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সংসদের স্থায়িত্ব ছিল ১২ দিন। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে কম ভোট পড়ে এ নির্বাচনে।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সীমিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬ সালে। এ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের বিপরীতে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৮১টি দল থেকে মোট ২ হাজার ৫৭৪ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেয়। ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৬, বিএনপি ১১৬ এবং জাতীয় পার্টি ৩২ আসনে জয়লাভ করে।

৮ম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবর। অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিজেতা এবং বিজয়ী উভয় দলের জন্যই ছিল গাণিতিক ধাঁধা। পরাজিত দল আওয়ামী লীগ ৪০.০২ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ২০.৬৬ আসন লাভ করে (Gain, 2006, p. 199)। বিএনপি একাই সংসদের ১৯২টি আসন লাভ করে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর তাদের পাঁচ বছর মেয়াদের শাসনকাল পূর্ণ করে। সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন। বিরোধী দলগুলোর ব্যাপক আন্দোলনের মধ্যে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ১১ জানুয়ারি ঘটে যায় বড় পরিবর্তন। অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নির্বাচন বাতিল ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অর্থনীতিবিদ ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে প্রধান করে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ৯ম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি ও বিএনপি ৩০টি আসন পায়।

৩০ জুন ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। সে কারণে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় সরকারের অধীনে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অনেক দলই বর্জন করে এবং আওয়ামী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ১৭টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচনটি নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সারণি ১ : বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩-২০১৪)

সংসদ	নির্বাচনের তারিখ	ভোটার (মিলিয়ন)	প্রদত্ত ভোট (%)	আ.লীগ	বিএনপি	জা.পা	জামায়াত
১ম	৭ মার্চ ১৯৭৩	৩৫.২১	৫৪.৯০	২৯৩	--	--	নিষিদ্ধ
২য়	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	৩৮.৩৬	৫১.৩০	৩৯	২০৭	--	৬
৩য়	৭ মে ১৯৮৬	৪৭.৩১	৬১.১০	৭৬	অংশ নেয়নি	১৫৩	১০
৪র্থ	৩ মার্চ ১৯৮৮	৪৯.৮৬	৫২.৫০	অংশ নেয়নি	অংশ নেয়নি	২৫০	অংশ নেয়নি
৫ম	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১	৬২.১৮	৫৫.৪০	৮৮	১৪০	৩৫	১৮
৬ষ্ঠ	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬	৫৬.১২	২১.০০	অংশ নেয়নি	২৫০	অংশ নেয়নি	অংশ নেয়নি
৭ম	১২ জুন ১৯৯৬	৫৬.৭২	৭৫.৬০	১৪৬	১১৬	৩২	৩
৮ম	১ অক্টোবর ২০০১	৭৫.০০	৭৪.৯০	৬২	১৯৩	১৪	১৭
৯ম	২৯ ডিসেম্বর ২০০৮	৮১.১৩	৮০.০০	২৩০	৩০	২৭	২
১০ম	৫ জানুয়ারি ২০১৪	৯১.৯৭	৯০.৪৫	২৩৪	অংশ নেয়নি	৩৪	অংশ নেয়নি

বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

গণমাধ্যমের বিস্তার আজ বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সব ধরনের গণমাধ্যম – সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশে আছে। মালিকানার দিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশে দুই ধরনের গণমাধ্যম আছে – এক. রাষ্ট্রীয় দুই. বেসরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যম। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ছাড়া বাকি সব গণমাধ্যমই বেসরকারি মালিকানাধীন।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে গণমাধ্যম পরিস্থিতির অনেক ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বের অন্য দেশগুলোতেও এ ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা হারিয়েছে। আবার অনলাইন মাধ্যমের বিবর্তনের কারণে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস বেশ পুরোনো হলেও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এসে দেশ সেনাশাসনের কবলমুক্ত হওয়ার পর গণতন্ত্রে উত্তরণের মধ্য দিয়ে দেশে সংবাদপত্রশিল্পের জন্য তৈরি হয় অনুকূল পরিবেশ। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রশিল্পে বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতার নতুন বাতাবরণ আমরা লক্ষ করি। নতুন নতুন পত্রিকার হাত ধরে এদেশের সাংবাদিকতায় আসে নতুন নতুন প্রবণতা আর যোগ হয় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সবশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট পত্রিকার সংখ্যা ৬৫৯টি (Department of Films & Publications, 2018)। এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৫১০টি। রাজধানী থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৩২৬টি আর রাজধানীর বাইরে থেকে প্রকাশিত হয় ৩৩৩টি।

অন্যদিকে গত দুই দশকে সম্প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এখন সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ৪১ (Ministry of Information, 2018)। এর মধ্যে ২৯টি টিভি চ্যানেল চালু আছে, বন্ধ আছে দুটি টিভি চ্যানেল। বাকি ১১টি টিভি চ্যানেল চালুর অপেক্ষায় আছে।

রেডিও চ্যানেলের মধ্যে এফএম ও কমিউনিটি দুই ধরনের রেডিও চ্যানেল আছে। চারটি বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল বর্তমানে তাদের কার্যক্রম চালু রেখেছে। আর কমিউনিটি রেডিও চালু আছে ১৫টি (BNNRC, 2018)। অন্যদিকে সরকারি সংবাদ সংস্থা ছাড়া প্রথম বেসরকারি সংবাদ সংস্থা ইউএনবির পাশাপাশি কয়েক শত অনলাইন গণমাধ্যম চালু আছে। দেশের মূলধারার গণমাধ্যম বা দৈনিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর অধিকাংশের অনলাইন ভার্শন প্রকাশিত হয়। ফলে সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বহুত্ববাদিতা সহজেই চোখে পড়ে। তবে স্বাধীনতা ও মানের দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থাকে যথেষ্ট প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। স্বাধীন সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করে, এমন ৪৬টি আইন ও নীতিমালা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। এসব আইন ও নীতিমালা কোনো না কোনোভাবে দেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ সালের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম (Arman, 2018)।

অধ্যায় ৩

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান

- নির্বাচনী আইন ও নিয়মকানুন : ক্ষেত্রসমূহ
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সম্পর্কিত আইনসমূহ

নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হলো নির্বাচন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হলে ভোটাররা নির্দ্বিধায় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এ চর্চা সামাজিক সংহতি ও শান্তি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলে তার প্রভাব পুরো শাসনব্যবস্থা এবং দেশের ওপর পড়তে বাধ্য। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কিছু পূর্বশর্ত থাকে। এর মধ্যে একটি হলো নির্বাচন এমন একটি স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত উপায়ে পরিচালিত হবে, যেখানে ভোটাররা পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য অবাধে পাবেন। আরেকটি হলো, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও দলগুলো অবাধে এবং কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই তাঁদের প্রচার চালাতে পারবেন। সবশেষ, নির্বাচন-সম্পর্কিত আইনকানুন সবাই জানবেন ও মেনে চলবেন।

নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান : ক্ষেত্রসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজে স্বচ্ছ ও নিয়মমাফিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য যথাযথ এবং স্পষ্ট আইন ও নিয়মকানুন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা নির্বাচন কাভার করতে গেলে নির্বাচনী আইনকানুন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যকর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কাভারেজের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। পাঠক-দর্শক এবং ভোটারদের জানানোর আগে সাংবাদিকদের নিজেদেরকেই এসব আইনকানুন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও কার্যপরিধি, নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনী প্রচারের নিয়মকানুন, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার প্রক্রিয়া, মনোনয়ন ও প্রত্যাহার, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়, প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামাসহ সামগ্রিক বিষয়ে আইনকানুনগুলো সম্পর্কে সাংবাদিকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। এ ছাড়া সংবিধান ও নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে নির্বাচনের আগেই সাংবাদিককে ভালো জ্ঞান রাখতে হয়। বিশেষ করে বৈষম্য, সমস্যা এমনকি দুর্নীতি কিংবা অভিযোগগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে হলে নির্বাচনী আইনকানুন সম্পর্কে সাংবাদিকদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। প্রধান প্রধান যেসব বিষয়ের আইনগুলো সম্পর্কে সাংবাদিকদের বিশেষ নজর দিতে হয়, সেগুলো হলো :

১। ভোটারদের অধিকার

২। নির্বাচনী প্রক্রিয়া

৩। নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

৪। নির্বাচনী ব্যয়

৫। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদি।

১। ভোটারদের অধিকার

ভোটের অধিকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে ভোটাররা তাঁদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বা ব্যালেটের সাহায্যে সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী শাসনভার তুলে দেন। সে কারণে জনগণের ভোটের অধিকার ক্ষুণ্ন করে, এমন যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিকদের সজাগ থাকতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি হলো ভোটার নিবন্ধন যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা। প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলো ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের অর্থ দিচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় সাংবাদিকদের। এটি শুধু বেআইনিই নয়, বরং অনৈতিকও বটে। এ কারণে যখনই এটা ঘটবে তা নিয়ে প্রতিবেদন করতে হবে। যদিও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে বেআইনি, কিন্তু তার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়া হয়ে থাকে। সে কারণে এ ধরনের সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনের খবর তুলে ধরতে হবে। নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার, প্রার্থী কর্তৃক অসত্য ও মিথ্যা হলফনামা দাখিল, আচরণবিধি লঙ্ঘন বা কাউকে ভয়ভীতি দেখানো, নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পক্ষপাতমূলক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের খবর গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়।

ভোটারদের অধিকার প্রশ্নে নির্বাচন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেগুলো তাঁরা দায়িত্ব পালনের সময় খেয়াল রাখতে পারেন :

১. ভোটার হওয়ার যোগ্য সকল ব্যক্তি কি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন?

২. টাকা বা উপহারসামগ্রীর মাধ্যমে রাজনীতিবিদগণ কি ভোটারদের ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করছেন?

৩. ভোটারের পছন্দকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁদেরকে কি ভয়ভীতি বা হুমকিধমকি দেয়া হচ্ছে?

৪. ভোটাররা কোথায় ভোট দেবেন সে সম্পর্কে কি তাঁদের পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হয়েছে?

৫. নারী ও সংখ্যালঘু ভোটাররা কি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন?

৬. সকল প্রার্থীর জন্য সমক্ষেত্র (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) আছে কি না?

৭. সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারের কাজে সুবিধাগুলো ব্যবহার করছেন?

৮. মনোনয়নপত্র দাখিলে কি বাধা দেয়া হয়েছে?

৯. উসকানিকমূলক, সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন বক্তব্য কি দেয়া হয়েছে?

২। নির্বাচনী প্রক্রিয়া

ক. ভোটার নিবন্ধন ও ভোটার তালিকা যাচাই

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে জনগণ মূল চালিকাশক্তি কি না, তার জন্য দরকার একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরির আগে ভোটার নিবন্ধন থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটি

স্বচ্ছ ও নির্ভুল কি না, তা সাংবাদিকদের যাচাই করতে হয়। ভোটার তালিকায় কোনো প্রশ্নবিদ্ধ নামের অন্তর্ভুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা বা তা বাদ দেয়ার জন্য তালিকা পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকতে হয়। পুরো দেশ জুড়ে ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে না পারলে নির্বাচন-প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ভোটার তালিকায় সততা নিশ্চিত করতে এবং অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে কীভাবে ভোটার নিবন্ধন ও তালিকা করা হয় সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানতে হবে। এ ছাড়া সীমানা পুনর্নির্ধারণ অনুযায়ী ভোটার তালিকা বিন্যাস করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও সাংবাদিকদের জানতে হবে।

খ. নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণে সমতা

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। সংসদীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমানা পুনর্নির্ধারণ নির্বাচনী ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রশাসনিক সুবিধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও যতদূর সম্ভব সুষম জনসংখ্যা বণ্টনের নীতিতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে সাংবাদিকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

গ. নির্বাচনী প্রশাসন

- **স্বাধীন নির্বাচন কমিশন**

  অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দরকার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, ভোটার তালিকা প্রস্তুত রাখা, তফসিল ঘোষণা, ভোটের প্রস্তুতি গ্রহণ, লোকবল নিয়োগ, ভোট অনুষ্ঠান, ফলাফল ঘোষণাসহ নির্বাচনসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মীমাংসার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে পালন করতে হয়। এ কাজগুলোর কোনো একটি ব্যত্যয় ঘটলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের কাজের ওপর সাংবাদিকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

- **দল ও প্রার্থীর প্রতি কমিশনের মনোভাব পরীক্ষা করা।**

  যোগ্যতা যাচাইকালে কোনো প্রার্থীকে কি অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে? যদি তা-ই হয়, সেটি কি সরকারি বা ক্ষমতাসীন দলের সুবিধার জন্য করা হয়েছে? নির্বাচনী আইনগুলো সকল দলের জন্য কি সমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে? বিরোধী দলের অভিযোগগুলো সরকারি দলের অভিযোগের মতোই দ্রুত তদন্ত করা হচ্ছে? যখন সরকারি দল নির্বাচনী আইন ও নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে তখন তা তদন্তের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে?

- **কমিশনের যথাযথ আর্থিক সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা আছে কি না, তা যাচাই করা।**

  কমিশনের বাজেট ও হিসাব-নিকাশ কি সবার জন্য উন্মুক্ত? নির্বাচনী কর্মকর্তারা কি সমভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত? এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত বিশাল যজ্ঞের ভার থাকে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের

হাতে। এ কারণে তাঁদের উপযুক্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় আইনি কাঠামোর মধ্যে সাংবাদিকদের পরখ করে দেখতে হয় সেগুলো হলো :

১. ভোটার তালিকা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনর্নিরীক্ষিত হয়েছে এবং এর পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে কি জনমনে সন্তুষ্টি আছে?

২. ব্যালট পেপারে এমন কোনো অস্বচ্ছ বিষয় আছে কি, যা ভোটারদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব?

৩. প্রার্থীরা নির্ভয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারছেন কি না।

৪. ভোটার, ব্যালট পেপার ও ব্যালেট বাক্সের পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা করা হয়েছে কি না।

৫. ব্যালট গণনার জন্য স্বচ্ছ কোনো ব্যবস্থা আছে কি না।

৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলকে অনুমতি দেয়া হয়েছে কি না।

৭. গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষক দল কি নির্ভয়ে নির্বাচন কাভার করতে পারেন?

৮. অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে কি নির্বাচন কমিশন মুক্ত?

৯. নির্বাচনী আইন ভঙ্গ হলে সে ব্যাপারে অভিযোগ দায়েরে রাজনৈতিক দল/প্রার্থীদের জন্য কি প্রতিষ্ঠিত সুব্যবস্থা আছে?

১০. অভিযোগ দাখিল হলে কি সে ব্যাপারে দ্রুত ও সুস্পষ্টভাবে সাড়া দেয়া হয়?

১১. সকল দল ও প্রার্থী কি নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য কাভারেজ পাচ্ছে?

১২. ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্বচ্ছন্দে ভোট প্রদান করতে পারে কি না।

ঘ. প্রার্থী ও দল

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও দলের ক্ষমতা এবং তাদের অধিকারগুলো সাধারণ আচরণবিধির মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। আচরণবিধিতে এ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন সংক্ষেপে লেখা থাকে। যেমন, কখন থেকে প্রচার কাজ শুরু করতে পারবে, কতদিন প্রচার চালাতে পারবে, নির্বাচনী ব্যয় কত হবে, কীভাবে এর হিসাব দাখিল করতে হবে, প্রচারসামগ্রী – পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি কেমন হবে এসব বিষয়ের উল্লেখ আচরণবিধিতে থাকে। সাংবাদিকের কাজ হলো কারা এ আচরণবিধি মানছে না। যদি না মানে, তাহলে কেন মানছে না তা খুঁজে বের করা। যদি সব দল এই আচরণবিধি মেনে নেয়, তাহলে সবাই এটি পালন করছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

দল ও প্রার্থীর অধিকারসমূহ

- নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে নির্বাচন করার জন্য সমান সুযোগ দেয়া হচ্ছে কি না।

- আইনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ ছাড়া রাজনৈতিক সভার আয়োজন করা, পোস্টার ছাপানো ও বিলি করতে দেয়া হচ্ছে?
- নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল দল ও প্রার্থীর প্রতি সমআচরণ করছে কি?
- কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সকল প্রার্থী ও জনসভাস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে কি?
- কোনো বিশেষ গোষ্ঠী কি কোনো একটি দলের পক্ষে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে?
- কোনো প্রার্থী বা তার প্রচারকাজে অংশ নেয়া কোনো ব্যক্তিকে কি হুমকি, হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণ করা হয়েছে?
- ভোট দেয়ার জন্য কোনো ভোটার কি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন বা তাঁদের বেআইনিভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে?

দল ও প্রার্থীর কর্তব্যসমূহ

- সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ডে উসকানি দেবে না এবং জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো কাজ করবে না।
- এমন কোনো মন্তব্য বা বিবৃতি দেবে না, যা অন্য দল বা জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে কোনো গোষ্ঠীকে আহত করে বা সম্মানহানি করে।
- প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ করবে না।
- অন্য দল ও প্রার্থীর কর্মসূচি পণ্ড করবে না এবং তাঁদের নির্বাচনী ক্যাম্প, প্রতীক, পোস্টার ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করবে না।
- নির্ধারিত দিনের আগে কখনই নির্বাচনী প্রচারকাজ শুরু করবে না।
- অর্থ বা উপহারের মাধ্যমে ভোট কেনার চেষ্টা করবে না।
- দলের যেসব সদস্য আচরণবিধি মানে না তাদের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেবে।
- নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের উৎস ও খাতগুলো জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা এবং হিসাব-নিকাশ স্বচ্ছ রাখা।
- প্রচারকাজে সরকারি কোনো সম্পত্তি বা অর্থ কিংবা জনবল ব্যবহার না করা।

প্রার্থীর যোগ্যতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতার শর্তগুলো কী কী, তা রিপোর্টারকে জানতে হবে। বয়সসহ কোন কোন শর্ত অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। কোনো শর্ত সম্পর্কে আদালতের কোনো রায় বা পর্যবেক্ষণ থাকলে সে সম্পর্কেও রিপোর্টারকে জানতে হবে। আবার অর্থনৈতিক ও আইনি কারণসহ অন্য যেসব কারণে একজন প্রার্থী অযোগ্য হন, সে বিষয়েও রিপোর্টারের ধারণা থাকতে হবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সম্পর্কিত আইনসমূহ

পশ্চাদ্‌মুখী গণতান্ত্রিক দেশে যেমন নির্বাচনে কারচুপির ঘটনা ঘটে তেমনি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের ঘটনা একেবারে বিরল নয়। যেমন, ১৯৯৭ সালে ফ্রান্সের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'ভুতুড়ে ভোটার' নিবন্ধন এবং ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটিং মেশিনের বিপত্তির কথা তুলে ধরা যায়। তবে রাজনৈতিক দল, নাগরিক, আদালত, সরকার ও সামরিক বাহিনীসহ দেশের আপামর মানুষ যখন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে রাজনৈতিক জীবনের মৌলিক উপাদান হিসেবে মেনে নেয় তখন নির্বাচনে অনিয়ম অনেক কম হয়। আমাদের মতো বিকাশমান বা ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও কার্যকর নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাপক। এ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার জন্য সাংবাদিকদের নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধানগুলোর একটি তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো। প্রয়োজনসাপেক্ষে এই আইনগুলোর ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। আইনগুলো হলো :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান : অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে ৬৭

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান : অনুচ্ছেদ ১১৮ থেকে ১২৬

৩. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২

৪. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮

৫. সীমানা পুনর্নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

৬. রাজনৈতিক দলসমূহের অধ্যাদেশ, ১৯৭৮

৭. জাতীয় সংসদ সদস্য (বিরোধ নিষ্পত্তি) আইন, ১৯৮০

৮. নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

৯. নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮

১০. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনীসহ)

১১. সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮

১২. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯

১৩. ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯

১৪. ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২

১৫. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০

১৬. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪

১৭. জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই ও সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪

১৮. স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১

১৯. বিদেশি পর্যবেক্ষক নীতিমালা, ২০১৩

২০. স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা, ২০১৭

২১. জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪।

অধ্যায় ৪

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন রিপোর্টিং: আদর্শ সাংবাদিকতার মূলনীতিসমূহ

- নির্ভুলতা
- ভারসাম্য
- স্পষ্টতা
- দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা

নির্বাচন রিপোর্টিং : আদর্শ সাংবাদিকতার মূলনীতিসমূহ

জনগণের চূড়ান্ত রায়ের যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন অবাধ ও সুষ্ঠু একটি জাতীয় নির্বাচন। আর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দরকার মুক্ত এবং স্বাধীন গণমাধ্যম। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, শুধু স্বাধীন গণমাধ্যম হলেই চলে না, বরং দরকার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম। স্বাধীনভাবে নানা পক্ষের মত তুলে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের দায়িত্বও কম নয়। এ দায়িত্বের মূল কথা হলো গণমাধ্যম বা সাংবাদিকরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করবে। এজন্য বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বের কিছু মানদণ্ড রক্ষা করতে হয়। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের পেশাগত মানদণ্ডের শর্তগুলো প্রায়ই কমবেশি একই রকম। এগুলো সংক্ষেপে বলা হয় – ABC। অর্থাৎ Accuracy (যথার্থতা/নির্ভুলতা), Balance (ভারসাম্য) এবং Clarity (স্পষ্টতা)। নির্বাচন রিপোর্টিংয়েও সাংবাদিকদের এই শর্তগুলো মানতে হয়।

নির্ভুলতা/যথার্থতা

প্রত্যেকটি ইস্যু বা ঘটনা নির্ভুল তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। কোনো রিপোর্ট যদি নির্ভুল না হয়, তাহলে তা পাঠক/দর্শকের কাছে গৃহীত হবে না। তাই নির্ভুলতা হলো প্রথম আইন বা শর্ত। এটি সাংবাদিকতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি ও শর্ত। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ সাংবাদিকদের নেই। বলা হয়, *Accuracy is the first law: get it right, first time.* (Grant and Gibbings, 2009, p. 17)। নির্বাচনসহ যে-কোনো পরিস্থিতি ও ইস্যুতে সাংবাদিকদের এই মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয়। একজন সাংবাদিককে সব সময় সত্যের সন্ধানে নিবিষ্ট হতে হবে। আর সত্য বেরিয়ে আসে নির্ভরযোগ্য রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে। বলা হয়, *A journalist must search for truth and recount it as completely as possible while exercising a critical sense that demands systematic confirmation of all facts in the article.* (Barraquand, Anstett, Deloire, & Pierre, 2013, p. 17)।

নির্বাচনের সময় প্রার্থী ও ভোটাররা আবেগপ্রবণ হতে পারেন। তাঁদের আবেগঘন বক্তব্যে অনেক মিথ্যা ও ভুল তথ্য থাকতে পারে। সে কারণে প্রার্থী ও ভোটারদের বক্তব্যের যথাযথ অর্থের প্রতিফলন যাতে ঘটে, সেভাবে রিপোর্ট করতে হবে। তাঁদের বক্তব্যের অতিরঞ্জন বা আংশিক তুলে ধরা যাবে না। নিরপেক্ষতা যে-কোনো আদর্শ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সমালোচনা সবচেয়ে বড় ঢাল – *A reporter's best protection against criticism is to be able to show that the story is fairly balanced and the reporter is personally impartial.*

(Howard, 2004, p. 16)। সংবাদের নির্ভুলতা বা যথার্থতা রক্ষার জন্য একজন ভালো সাংবাদিককে তথ্য ও মতামতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। তথ্য হলো এমন কোনো সত্য বিষয়, যা ঘটবে বা ঘটেছে। তিন ধরনের তথ্য আছে : এক. যা সত্য বলে প্রমাণিত; দুই. এমন তথ্য যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু এখনও প্রমাণিত নয়; তিন. এমন তথ্য যা সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। অবশ্যই একজন সাংবাদিককে তার রিপোর্টে প্রমাণিত সত্য তথ্যই তুলে ধরতে হবে। নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের সময় অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, একদিকে প্রতিযোগিতা অন্যদিকে সময়ের স্বল্পতার কারণে সাংবাদিকদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দ্রুততা কখনই সততা ও নির্ভুলতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

তথ্য ও মতামতের মধ্যকার দেয়াল

সংবাদ প্রতিবেদন থেকে মতামত দূরে রাখতে হবে। কোনোভাবেই সংবাদ প্রতিবেদনটি আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের মতামতধর্মী প্রতিবেদন হতে পারে না। প্রতিবেদক হয়ে কোনো ঘটনা বা ইস্যুর বিচারক আপনি হতে পারেন না। পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের বিচারক হতে দিন। নিচের দুটি সংবাদ সূচনার তুলনা করুন :

১) "জনাব 'ক' এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন যা বিশাল জনসমুদ্র তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে সাদরে গ্রহণ করে।"

২) "জনাব 'ক' ৩০ মিনিট ভাষণ দেন। উপস্থিত জনতার করতালির জন্য তাকে ভাষণ দেয়ার সময় বেশ কয়েকবার থামতে হয়। গোল চত্বর থেকে সড়ক পর্যন্ত পুরোটা জুড়ে জনতার ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল।"

লক্ষ করুন, দ্বিতীয় সংবাদ সূচনাটি অনেক বেশি তথ্যনির্ভর। এখানে এমনভাবে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে পাঠক বুঝতে পারেন কী ঘটেছিল। কিন্তু প্রথম প্রতিবেদনটির মতো এখানে বক্তার পক্ষে যায়, এমন কোনো সম্পাদকীয় বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি।

নির্ভুল ও যথাযথ তথ্য তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হয় :

- মিথ্যা বা গুজবের ওপর ভিত্তি করে কোনো সংবাদ করা যাবে না। যাচাই ছাড়া কোনো তথ্যকে সত্য বলে ধরে নেয়া যাবে না।
- কমপক্ষে দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করতে হবে।
- যদি কখনও কোনো তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে সে তথ্যটি প্রকাশ করা যাবে না। ব্যাকরণ ও ভাষাগত দক্ষতা দিয়ে তথ্যের অস্পষ্টতা ঢাকার চেষ্টা করা যাবে না।
- গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না।
- প্রার্থীর নাম, সংখ্যা, মন্তব্য ও প্রেক্ষাপট ঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। নির্বাচন রিপোর্টের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রার্থীর নাম ভুলভাবে লিখতে দেখা যায়। আপনি যদি মানুষের নাম, স্থান ও

ঘটনা ঠিকভাবে তুলে না ধরেন, তাহলে পাঠককে ভুল তথ্য জানাবেন। এক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

- নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের সময় বেনামি কোনো সূত্রের মন্তব্য দেয়া যাবে না। বেনামি মন্তব্য অর্থহীন, অকাজের। অন্যান্য বক্তব্যের মতো নির্বাচনী বক্তব্য প্রচারের মধ্য দিয়েও মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে।
- যখন কোনো সাংবাদিক জানতে পারেন যে তাঁর দেয়া তথ্য ভুল, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভুল স্বীকার করে ঠিক তথ্যটি পরিবেশন করতে হবে এবং একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে সংশোধনীটি ছাপাতে হবে।

ভারসাম্য

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আদর্শ সাংবাদিকতার প্রত্যেকটি আচরণবিধিতে নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে-কোনো পেশাদার সাংবাদিকের লক্ষ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ, ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ রিপোর্ট করা। শব্দ বা ছবি, যে উপায়েই হোক না কেন, সংবাদ রিপোর্টকে হতে হবে নিরপেক্ষ। এটি নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের মৌলিক ভিত্তি। সাংবাদিকদের পেশাদারিত্ব রক্ষার জন্য বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ রিপোর্টিংয়ের কোনো বিকল্প নেই – *Modern journalism is critical and engaged – but always based on a high professional level of fairness.* (Hansen & Albadri, 2016)।

নির্বাচন সাংবাদিকতায় নিরপেক্ষ রিপোর্টিংয়ের অর্থ হলো কোনো পক্ষাবলম্বন না করা। নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য একজন ভালো সাংবাদিক ভারসাম্যপূর্ণভাবে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করে থাকেন। অর্থাৎ একটি ঘটনা বা ইস্যুর সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের মত ও বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করতে হয়।

নুরুল ইসলাম বিএসসি বনাম সামছুল আলম 'এসএসসি'

চট্টগ্রাম-৮ (কোতয়ালি) আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নুরুল ইসলাম ও ধানের শীষ প্রতীকের মোহাম্মদ সামছুল আলম। কয়েক দিন ধরে তাঁরা গড়ে ১১ ঘণ্টা গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। দুজনই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে বিএসসি ও এসএসসি। নুরুল ইসলাম ব্যবসার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আর সামছুল আলম রাজনীতিতে নতুন। প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হওয়ার জন্যে। মনোনয়ন না পেয়ে তিনি এখন বিএনপির প্রার্থী। এ দুজনের মধ্যেই চট্টগ্রাম-৮ আসনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ভোটারদের ধারণা।

কোতয়ালির এ আসনটি চট্টগ্রামের রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জ, আছাদগঞ্জ ও চাক্তাইয়ের অবস্থান এ আসনে। এই দুজনের ব্যবসায়িক কার্যালয় খাতুনগঞ্জে অবস্থিত।

নগরবাসীকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে তারা। কিন্তু কেউ কারোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছেন না। ভোটাররা বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সংখ্যালঘু ভোটাররা এই আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে ভূমিকা রাখতে পারে। এই আসনে তিন লাখ ২০ হাজার ৮৬৪ জন ভোটারের মধ্যে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা ৭৫ হাজার ৭২১। মহাজোটের প্রার্থী নুরুল ইসলাম বিএসসি সংখ্যালঘু ভোটারদের তাঁর দিকে টানার ব্যাপারে আশাবাদী। অন্যদিকে চারদলীয় জোটের সামছুল আলমও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে যাচ্ছেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান চারদলীয় জোটের প্রার্থী হয়ে এই আসনে জয়ী হন। আগেরবার ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অবশ্য জয় পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী এম এ মান্নান। সাবেক মন্ত্রী নোমান এবার কেতোয়ালি ছেড়ে চট্টগ্রাম-৯ (ডবলমুরিং-পাহাড়তলি) আসনে নির্বাচন করছেন।

নুরুল ইসলাম বিএসসি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমি সবসময় স্বচ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর ভোটাররাও যোগ্য প্রার্থী দেখতে আগ্রহী। জয়ী হলে জনগণের জন্যে কাজ করব।' মোহাম্মদ সামছুল আলম বলেন, 'নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ভোটারদের কাছে গিয়ে মনে হচ্ছে, তারা নতুন প্রার্থীকে এমপি হিসেবে দেখতে চায়'।

ভোটারদের ভাবনা : পাথরঘাটার বাসিন্দা আব্দুল আউয়াল বলেন, 'কোতয়ালি আসনে সব প্রার্থী কম বেশি শিক্ষিত। এর মধ্যে যার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি এবং জনগণের জন্যে কাজ করার আগ্রহ রয়েছে, তাকে আমরা ভোট দিব।'

আছাদগঞ্জের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী আবদুর রহিম বলেন, 'নুরুল ইসলাম বিএসসি ও সামছুল আলম ব্যবসায়ী হিসেবে সফল। তাদের দুর্নামও নেই। আমরা আসলে দ্বিধায় আছি এই দুজনের মধ্যে কাকে ভোট দিব।'

অন্য প্রার্থী : চারদলীয় জোট ও মহাজোটের দুই প্রার্থীর বাইরে এ আসনে আরও পাঁচজন প্রার্থী রয়েছেন। এদের মধ্যে শুধু শফিউদ্দিন কবির আবিদের প্রচারণা ভোটারদের নজর কাড়ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী আবিদের পক্ষে ভোট চাইছেন। অন্য চার প্রার্থীর পোস্টার বা প্রচারণা চোখে পড়েনি।

ওপরের রিপোর্টের মূল বক্তব্যটি হলো একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্য প্রার্থীর চেয়ে কম। কিন্তু এ তথ্যটি প্রতিবেদক কোথা থেকে পেয়েছেন তার উল্লেখ প্রতিবেদনে নেই। ধরে নেয়া যেতে পারে, তিনি হয়তো হলফনামার আটটি তথ্য থেকে এটি পেয়েছেন। তাহলে অন্য সাতটি তথ্য তিনি কেন উল্লেখ করেননি? অন্য সাতটি তথ্যে বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা যার বেশি সেই প্রার্থীর কি কোনো দুর্বলতা ছিল? এ ধরনের আংশিক তথ্যসম্পন্ন প্রতিবেদন পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে।

নির্বাচনের মৌসুমে প্রতিবেদনে মতামত তুলে ধরার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভারসাম্য আনতে হবে। তবে পক্ষপাতহীনতা বলতে প্রত্যেকটি দল এবং প্রার্থীকে সমান স্থান ও সময় দেয়াকে বোঝায় না। রিপোর্টার অবশ্যই সংবাদমূল্য বিবেচনায় সংবাদ লিখবেন। এক্ষেত্রে পাঠক বা দর্শকের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়গুলো তাকে বিবেচনায় নিতে হবে। সাধারণত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে, এমনটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কোনো একটি বিশেষ দল বা প্রার্থীর প্রতি কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ এখানে নেই অথবা কোনো একটি দল বা প্রার্থীকে অবনমন করে সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না। আবার যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। এখানে নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্য বলতে প্রত্যেক রিপোর্টে প্রত্যেক দলকে স্থান দেয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে না, বরং এর অর্থ হলো পেশাদার সাংবাদিক কারও পক্ষ নেবেন না। তারা মানুষের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে প্রশ্ন করবেন, তথ্য জানবেন, প্রাপ্ত উত্তরগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবেন, বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরবেন, পটভূমি উপস্থাপন করবেন যাতে পাঠক/দর্শক একটি ইস্যু বা ঘটনার সব দিক বুঝতে পারেন।

এখানে ভারসাম্য কোনো সৌজন্যতা নয়। এটি প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যই পালনীয় একটি শর্ত। বিশেষ করে, নির্বাচনী প্রচারের সময় যখন প্রার্থীরা একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন। সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ বা অপমানকর কোনো মন্তব্য অভিযুক্ত বা ভুক্তভোগীর বক্তব্য ছাড়া ছাপানো যাবে না। মনে করুন, প্রার্থী 'ক' প্রার্থী 'খ'-এর বিরুদ্ধে খুবই আপত্তিকর কিছু বলেছেন। এক্ষেত্রে আপনি সেটি তুলে ধরতে পারেন। তবে সে অভিযোগ সম্পর্কে 'খ' প্রার্থীর বক্তব্য সংগ্রহ করতে হবে এবং একই সংবাদে তা প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে সংবাদে ভারসাম্য আনতে হবে।

গরিব-দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই

অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের লড়াই

নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন নই

একটি নির্দিষ্ট আসনে ভারসাম্যপূর্ণ কাভারেজের একটি ভালো উদাহরণ পাশের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাটি। এখানে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সবল ও দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি ভোটারদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। কোনো একজন প্রার্থীর পক্ষে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। একজনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আরেকটি দিক হলো রিপোর্টার কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবে না। কোনো দলের কর্মীর মতো ব্যবহার করলে রিপোর্টার তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। Ross Howard (2004, p. 9) বলেছেন, *A journalist's impartiality means that a reporter must not take an active role in any election as a campaigner, offer financial or other support to a party or take gifts from a party.*

স্পষ্টতা

রিপোর্টকে শুধু নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ হলে চলবে না, বরং তাকে স্পষ্টও হতে হবে। কারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য না হলে সে রিপোর্টের কোনো মূল্য নেই। তা ছাড়া নির্ভুলতার সঙ্গে স্পষ্টতার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রিপোর্টে যে-কোনো তথ্যের জন্য সূত্রের পরিচিতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সাংবাদিকরা কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তা স্পষ্ট না হলেও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে – *The media and journalists are obliged to explain to the audience how they have obtained the information they publish.* (Temenugova, Sopar, Dimitrovski, & Tahiri, 2013, p. 17)।

মনে রাখতে হবে, আপনার সংবাদ পাঠক/দর্শকের জন্য, তারা বুঝতে না পারলে আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। সে কারণে পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় এমনভাবে সংবাদ লিখুন। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ বাদ দিয়ে সহজ করে লিখুন। রাজনৈতিক পরিভাষা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তার ব্যাখ্যাসহ সহজ করে লিখুন। কোনো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতে হলে একবার তার পূর্ণাঙ্গ রূপ উল্লেখ করুন।

দিরাই-শাল্লার ভোটারদের প্রধান ইস্যু উন্নয়ন

পশ্চাৎপদ দিরাই ও শাল্লা উপজেলায় মানুষ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এবার একাট্টা। দিরাই ও শাল্লা উপজেলা নিয়ে সুনামগঞ্জ-২ আসন গঠিত। দিরাই-শাল্লা আসন থেকে এ পর্যন্ত যে কজন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তারা কেউই এলাকার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের অনুশোচনা ও ক্ষোভ এর অন্ত নেই। সবার একই অভিযোগ, ভাটি অঞ্চলের উন্নয়ন হচ্ছে না শুধু রাজনৈতিক ঐক্য ও উদ্যোগের অভাবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে দলই এসেছে তারা মুখের বুলি ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষকে কিছুই দিতে পারেননি। আর এ কারণেই দিরাই-শাল্লার মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। কালনী, কুশিয়ারা, সুরমা ও দাড়াইন নদী পুনঃখনন করা হলে এখানে রয়েছে বাণিজ্য বন্দর গড়ে তোলার সম্ভাবনা। এ অঞ্চলে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কৃষি পণ্যের বাজার গড়ে ওঠেনি শুধু উদ্যোগের অভাবে। সুনামগঞ্জ-২ নির্বাচনী এলাকার মানুষ এবার এসব কিছুর আমূল পরিবর্তন চান। তারা

চান এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, নদী সংস্কারের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কালনী, সুরমা, কুশিয়ারা ও দাড়াইন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সুবিধা, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, হাট বাজার সংস্কার ইত্যাদি।

এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ভোটারদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এবার কোন দল নয় তারা সমর্থন দেবেন যোগ্য, সৎ ও বিবেকবান প্রার্থীকে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাবেক সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও '৯৬-র নির্বাচনের আগে ও পরে সব কটি নির্বাচনে দোয়াত কলম, কুঁড়ে ঘর ও নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন কিন্তু এলাকার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না করায় আসন্ন নির্বাচনে সেনগুপ্তের বিজয়ের ক্ষেত্রে বিএনপির প্রার্থী জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক সাংসদ নাছির উদ্দিন চৌধুরী বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। একটি সূত্র জানায়, দিরাই-শাল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীর নাম প্রকাশের জন্যে ১৯ নভেম্বর এক কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। আর এ দায়িত্ব দেয়া হয় দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলতাব উদ্দিনের ওপর। সে মোতাবেক আলতাব উদ্দিন কর্মী সভার আয়োজন করেন। ঢাকা থেকে সেনগুপ্ত ফোনে কর্মী সভা স্থগিত রাখার জন্যে বলেন। ওই দিনই সেনগুপ্ত ঢাকা থেকে ফিরে আসেন দিরাইয়ে। পৌরসদরস্থ বাসায় রাতে বসেন নেতাকর্মীদের নিয়ে। কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত থাকলেও অধিকাংশ নেতা কর্মী অনুপস্থিত ছিলেন রাতের মিটিংয়ে। এক পর্যায়ে গভীর রাতে উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে প্রবাসী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর নাম ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন উপস্থিত নেতাকর্মীরা। ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বলেন, ৪ মাস আগে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলতাব উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা আবিদ আলী ও আবু আব্দুল্লাহ চৌধুরী মাসুদকে গণসংযোগ করতে মাঠে নামান সুরঞ্জিত। ওই ফাঁকে উপজেলা নির্বাচনের সর্বশেষ তফসিল ঘোষণার আগ মুহূর্তে তোফায়েল আহমদ চৌধুরীকে আমেরিকা থেকে নিয়ে আসেন সুরঞ্জিত।

বাউলসম্রাটের নদীতে সেতু হবে কবে?

'কোন মেস্ত্রি নাও বানাইল, কেমন দেখা যায়, ঝিলঝিল করে রে আমার ময়ূরপঙ্খী নায়' – বাউলসম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জনপ্রিয় এই গান গেয়ে বৈঠা বাইছিলেন মাঝি রিঙ্কু দাশ, নতুন লোক ইজারা নেয়ার পর এক বছর পরে জনপ্রতি দুই টাকা করে নিয়ে সুনামগঞ্জের দিরাই এর কালনি নদীতে দিরাই-চানপুর খেয়াঘাটে যাত্রীদের পারাপার করছেন তিনি।

রিঙ্কু জানান, এই খেয়াঘাট দিয়ে দিরাইর করিমপুর, জগদল ও তাড়ল ইউনিয়নের মানুষ উপজেলা সদরে যাতায়াত করে। প্রতিবার সংসদ নির্বাচনের আগে সভা-সমাবেশে প্রার্থীরা কালনী নদীতে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচন শেষ হয়, আবার আসে; কিন্তু সেতু আর হয় না। উপজেলার তুকদিরাই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মনমোহন রায় (৬০) বলেন, 'একবার গাঙ পার অইতে কমচে কম এক ঘণ্টা লাগে। তয় একটা বিরিজ অইলে কত সুবিধা অইত। আমরা তাড়াতাড়ি নদী পার অইতে পারতাম। নেতারা যে কেনে বিরিজটা বানায় না, হেইডা বুঝতাম পারি না।' এবারের নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে মহাজোটের প্রার্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং চার দলের প্রার্থী বিএনপির নাছিরুদ্দিন চৌধুরী। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এর আগের নির্বাচনগুলোতে এই দুই প্রার্থী গণসংযোগ ও সভা-সমাবেশে বহুবার সেতুটি নির্মাণ করবেন বলে কালনী নদী তীরবর্তী মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দিরাই ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী মাইটাপুর গ্রামের সেলিনা বেগম বলেন, কালনী নদী পারাপার হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। অনেক দিন নৌকা নদীর অন্য পাড়ে থাকলে আসা-যাওয়ায় ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময় চলে যায়। এ কারণে সেদিন কলেজের প্রথম কয়েকটি ক্লাস করা সম্ভব হয় না। জগদল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মখলিচুর রহমান লাল মিয়া বলেন, 'চার কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি, জগদল থেকে গাড়িতে করে খেয়াঘাট আসতে সময় লাগে ১০ মিনিট। অথচ খেয়াঘাট থেকে দিরাই উপজেলা সদরে নৌকা পারাপার হতে সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা। একটা সেতু হলে এলাকাবাসীর অনেক সমস্যা দূর হত।' তাড়ল গ্রামের কলেজ শিক্ষক আনোয়ার চৌধুরী বলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা না রাখায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। এবারের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে। নাছিরুদ্দিন চৌধুরী অভিযোগ করেন, 'আমি ১৯৯৬ সালে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরে কালনী নদীতে সেতু নির্মাণের সব প্রাথমিক পরিকল্পনা শেষ করেছিলাম। কিন্তু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বিরোধিতার কারণে সেতু নির্মাণ করতে পারিনি। তাঁকে এ এলাকার মানুষ বারবার ভোট দিলেও তিনি এলাকার মানুষের বিন্দুমাত্র উন্নয়ন করেননি।' তিনি বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী হলে এবং দল ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই এই গণদাবী পূরণ করা হবে।' দিরাই পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজদ্দৌলহ বলেন, '১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় যায়, তখনি আমাদের এই সেতু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সে সময় আওয়ামী লীগ আমাদের প্রার্থী অনুমোদন না দেওয়ায় সেতুটি আর তৈরি করতে পারিনি। তবে এবার দল ও প্রার্থী ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু নির্মাণ করা হবে।' দিরাই উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী অহিদুর রহমান বলেন, 'সেতুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি নির্মাণের ব্যাপারে আমাদের কোনও পরিকল্পনা নেই।'

প্রথম রিপোর্টটির তুলনায় দ্বিতীয় রিপোর্টটি অনেক বেশি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এলাকার ভোটারদের একটি সুনির্দিষ্ট চাওয়াকে প্রণিধানযোগ্য করে তুলতে দ্বিতীয় রিপোর্টটি অনেক বেশি শক্তিশালী। এই প্রতিবেদনের মুখ্য এবং একমাত্র বিষয় হলো সেতুর অভাব। কিন্তু প্রথম রিপোর্টটিতে এত বেশি ইস্যুর কথা একসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে এলাকাবাসীর মূল সমস্যা কী তা স্পষ্ট নয়। কোন সমস্যার কারণে এলাকার মানুষ কী ধরনের সমস্যায় ভুগছে তাও পরিষ্কার নয় প্রথম রিপোর্টে, যেখানে দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে এলাকার মানুষের সমস্যাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার প্রথম রিপোর্টের শেষ ভাগে দলীয় কোন্দলের ইস্যুটি অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনায় পুরো রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা

দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ সমাজ কিংবা ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলোতে নির্বাচন সাংবাদিকতার জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এটি এমন একটি সময় যখন পরিবর্তন – বিশেষ করে সরকার, নীতি ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন নিয়ে মানুষ উৎসাহী হয়। আর এ উৎসাহ মানুষ ও গণমাধ্যমের আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এমনকি সবচেয়ে টেকসই গণতান্ত্রিক দেশেও গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার উত্তেজনাপূর্ণ অভিযোগগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি নাগরিকদের বক্তব্য ও কার্যত দৃশ্যমান বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নির্ভুলতা, যথার্থতা, নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের মানদণ্ড যেখানে অর্জিত হয়নি সেসব সমাজে ঝুঁকি বেশি। এগুলো ঘটতে পারে এমন একটি সমাজে, যেখানে দুর্বল আইন এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সুরক্ষা দেয়া হয় না এবং যেখানে দুর্নীতিপরায়ণ মালিক বা রাজনৈতিক নেতারা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এভাবে সংবাদ প্রায়ই পক্ষপাতমূলক হতে দেখা যায়। এমন পরিবেশে পেশাদার কোনো রিপোর্টকেও মানুষ বিশ্বাস করে না।

নির্বাচন সাংবাদিকতার জন্য সত্যিই একটি চরম চ্যালেঞ্জ। তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনগুলোকে নিয়ন্ত্রিত সংঘাত বলা যেতে পারে – এগুলো পরিচালিত হয় স্বচ্ছতার নীতিতে এবং সম্পাদিত হয় উন্মুক্তভাবে এবং এখানে অহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এক্ষেত্রে 'মুক্ত/অবাধ' ও 'স্বচ্ছ' নির্বাচনই সকলের কাম্য। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকেই গণমাধ্যমকে কড়া নজর রাখতে হয়। মুক্ত বা অবাধ নির্বাচনের অর্থ হলো সকল দল, প্রার্থী ও ভোটারের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। এর অর্থ হলো সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির গণমাধ্যম থেকে সমান সুবিধা পাবে। অর্থাৎ গণমাধ্যম কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সবার রিপোর্ট করবে। আর স্বচ্ছ

বলতে কোনো ধরনের কারচুপি ও ভয়ভীতি ছাড়া প্রচার এবং ভোট প্রদানের অধিকারকে বোঝানো হয়। গণমাধ্যমের কাজ হলো এই অবাধ ও স্বচ্ছ একটি নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

সাংবাদিকতার মৌলিক দক্ষতা, যেমন নির্ভুলতা ও ভারসাম্য, সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা ইত্যাদি যদি যথাযথভাবে না হয়, তাহলে নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অবদান রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যথার্থতা, নিরপেক্ষতা ও স্পষ্টতার সমন্বয়ে একটি দায়িত্বপূর্ণ রিপোর্টের জন্ম হয়। সাংবাদিকরা যা নিয়ে রিপোর্ট করছেন সে সম্পর্কে পাঠকের কাছে এবং যাদের নিয়ে রিপোর্ট করছেন তা নিয়ে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। সাংবাদিকরা তাদের পাঠক/দর্শকের প্রতি দায়বদ্ধ। জনস্বার্থে কাজ করার জন্য সাংবাদিকদের অবশ্যই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে পাঠক/দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সাংবাদিকরা তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো ধরনের রিপোর্টিং করবেন না। এমনকি নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের সময় সাংবাদিকরা জেনেশুনে কোনো অসত্য অভিযোগ নিয়ে রিপোর্ট করবেন না কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক বক্তব্য উভয় পক্ষের ভাষ্য ছাড়া প্রচার/প্রকাশ করবেন না। একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এভাবে ভোটারদের প্রতি সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।

নির্বাচন অন্য যে-কোনো ধরনের বিষয়ভিত্তিক রিপোর্টিং। অন্যান্য রিপোর্টিংয়ের মতোই এখানে পেশাদার সাংবাদিকদের ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তায়। যেমন, অন্য যে-কোনো ধরনের রিপোর্টিংয়ের মতোই এখানে সাংবাদিকরা তাদের সূত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এর অর্থ হলো সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকরা সৎ ও আইনি পদ্ধতি ব্যবহার করবে। যদি কোনো সূত্র তার পরিচয় গোপন করে প্রতিবেদককে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন, তাহলে প্রতিবেদকের দায়িত্ব হচ্ছে সে সূত্রের পরিচয় গোপন রাখা। সার্বজনীনভাবে এবং বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকের এই অধিকার স্বীকৃত। এটি সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। এই বিশ্বাস ভঙ্গের দায় অপরাধের শামিল। তবে গুজব বা মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সূত্র গোপন রাখা কোনো ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। সাংবাদিকদেরকে অবশ্যই সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্য যাচাই করতে হবে। Ross Howard (2004, p. 10) আদর্শ সাংবাদিকতার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক তুলতে গিয়ে বলেছেন, *Good journalism is like good medicine. Its values should not be political, cultural or racial. It helps support the good health of democracy.*

দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যাতে কোনোভাবে রিপোর্টে না ঘটে সেদিকে একজন সাংবাদিককে খেয়াল রাখতে হয় –

- **মানহানিকর**

  ভালো বা আদর্শ সাংবাদিকতায় কখনও কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা বা বানোয়াট অভিযোগ কিংবা তথ্য দিয়ে তার সম্মানহানি করা হয় না। নির্বাচনী সাংবাদিকতায় যে-কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যদি রিপোর্ট করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরতে হবে।

- **সূত্রবিহীন/ভিত্তিহীন**

  আদর্শ সাংবাদিকতায় কোনো তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়া তুলে ধরা হয় না। অন্য পত্রিকায় বা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যও সূত্রের উল্লেখ ছাড়া প্রকাশ করা যায় না।

- **বিদ্বেষপরায়ণ**

  সাংবাদিকতা খুব ক্ষমতাধর একটি পেশা। একটি সংবাদ একজন রাজনীতিবিদের সুনাম ধূলিসাৎ করে দিতে পারে, দলে তার অবস্থান নড়বড়ে করে দিতে পারে কিংবা তার বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে। পেশাদার সাংবাদিকরা তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে কখনই অন্যের ক্ষতি করার জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন না।

রাজনীতির নোংরা খেলা খেলতে গিয়ে চট্টগ্রামে কোণঠাসা মেয়র

চট্টগ্রামের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী একক আধিপত্য ও কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে এখন নিজেই হয়ে পড়েছেন কোণঠাসা। চাহিবামাত্র তাকে অর্থের যোগান দিতে পারে এমন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন দানের চেষ্টা চালিয়ে সফল হতে না পারায় এবারের নির্বাচনে তিনি মাঠে নামেননি দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে। বরং দলীয় প্রার্থী যাতে জিততে না পারে সেজন্য সব ধরনের তৎপরতা চালিয়েছেন। তার এ ধরনের নেতিবাচক তৎপরতা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে এবার মহাজোট তথা আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা আশাতীত ভালো ফলাফল করে মহিউদ্দিন চৌধুরীর দর্পচূর্ণ করে দিয়েছে। রাজনীতির ময়দানে তিনি হয়ে পড়েছেন নিঃসঙ্গ শেরপা। ২০০৫ সালে এক লাখ ভোটের ব্যবধানে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় জনপ্রিয়তার চরম শিখর থেকে তার এভাবে অধঃপতনের জন্য অতি অহংকার ও আশেপাশে ঘিরে রাখা চাটুকারদের ভূমিকাকে দায়ী করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। বৃহত্তর চট্টগ্রামে দলমত নির্বিশেষে মানুষের আলোচনায় এখন এ কথাটিই উঠে আসছে যে, মেয়র তার গদি রক্ষা করতে যে কোন ধরনের আপষকামিতা এবং একক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দলীয় নেতৃত্ব যাতে বিকাশ হতে না পারে সেজন্য নেতিবাচক তৎপরতা চালাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থানকেই নড়বড়ে করে ফেলেছেন।

২০০১ সালে ১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল মাত্র দুটি আসন। সে সময় মেয়র দলের হাইকমান্ডকে দেখাতে চেয়েছিলেন 'ভাবমূর্তি' বিক্রয় করে সাফল্য এনে দেবেন। কিন্তু সেবার তার ভাবমূর্তি বিক্রি বাণিজ্য সফল হয়নি। নির্বাচনে দলে ঘটে বিপর্যয়। এবার মেয়রের ভাবমূর্তি বিক্রির বাণিজ্য উদ্যোগ প্রথমেই ধাক্কা খায় মনোনয়ন পর্যায়ে। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ কোতোয়ালি-বাকলিয়া আসনে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি

শামসুল আলমকে মনোনয়ন পাইয়ে দিতে তৃণমূল নেতাদের ভোটের বাক্স ছিনতাই করে সর্বমহলে ব্যাপক সমালোচিত হন। এখানে হাইকমান্ড মনোনয়ন দেন রাজনীতিতে ক্লিন ইমেজের ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম বিএসসিকে। একজন চিন্তাশীল লেখক ও মননশীল লেখক হিসেবে শিক্ষিত সমাজেও দলমত নির্বিশেষে যার রয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। কোনদিন ক্ষমতায় না থেকেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থে ২২টি স্কুল-কলেজ, একাধিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ, গণপাঠাগার স্থাপন, কয়েকশ' মসজিদ, মন্দির, মঠে আর্থিক অনুদানসহ শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবায় তার অবদান সর্বমহলে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুললেও বরাবরই স্পষ্টবাদী হওয়ায় এবং নতজানু হতে পছন্দ না করায় মহিউদ্দিন চৌধুরী এ মনোনয়নকে মেনে নেননি। তিনি তার পছন্দের ব্যবসায়ী শামসুল আলমকে বিএনপির মনোনয়ন পাইয়ে দিতে নেপথ্য চেষ্টা চালিয়ে সফল হন।

এরপর দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে তিনি নানাভাবে সক্রিয় তৎপরতা চালাতে থাকেন। তার পছন্দের বিএনপির প্রার্থী যাতে বিজয়ী হতে পারেন সেজন্য সংখ্যালঘু ভোটারদের নেতাদের ডেকে বলেন, "আমার ২৫ হাজারের মতো 'না' ভোট চাই।" আবার কিছু কিছু ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও দলের ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দকে নূরুল ইসলাম বিএসসির পক্ষে বেশি সক্রিয় না হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপরেও দলের নেতাকর্মীরা সেসব নির্দেশ অমান্য করে নেমে পড়েন দলীয় প্রার্থীর পক্ষে। বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ বণ্টনের দায়িত্ব পালনে কর্মীদের নিষেধ করায় বহু এলাকার ভোটার 'নৌকা'র স্লিপ পাননি। মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনবার নূরুল ইসলাম বিএসসি মেয়রের বাসায় গিয়েছিলেন দেখা করতে। কিন্তু মেয়র তাকে সাক্ষাৎ দেয়ার মত সাধারণ সৌজন্যতাবোধ প্রদর্শন না করায় বিষয়টিও চট্টগ্রামবাসী ভালোভাবে নেয়নি। বরং এসব কিছু ভোটারদের মধ্যে নূরুল ইসলাম বিএসসির গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়েছে। যে কারণে মেয়র ও তার অনুগত মহানগর সাধারণ সম্পাদক কাজী ইনামুল হক দানুর সক্রিয় বিরোধিতার পরও নূরুল ইসলাম বিএসিসি প্রায় ৩১ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

মেয়র মহিউদ্দিনের সব কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান সহযোগী ইনামুল হক দানু। মেয়র নিজে কাউন্সিলরদের ভোটাভুটি ছাড়াই নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ বাগিয়ে নিয়েছেন। আর সহযোগী দানুকে বসিয়েছেন সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে। আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরাই দানুকে 'গৃহপালিত নেতা' হিসেবে ডাকেন। মেয়র মহিউদ্দিনের সভা-সমাবেশ ছাড়া আর কোন দলীয় কর্মকাণ্ডে তাকে দেখা যায় না। মেয়রের হয়ে তিনি এমন সব অপকর্ম করে চলেছেন, যা দলের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হচ্ছে বলে নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন। ২৭ ডিসেম্বর লালদীঘি ময়দানে শেখ হাসিনার জনসভায়ও দানু এরকম একটি ঘটনা ঘটান। মেয়রের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম-১০ আসনে মহাজোটের মনোনয়নপ্রাপ্ত চেম্বার সভাপতি এমএ লতিফ তখন বক্তব্য রাখছিলেন। বক্তব্যে লতিফ জনসভায় উপস্থিত লাখও জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, আওয়ামী লীগের এতো বিপুলসংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি কর্মীবাহিনী থাকতেও চট্টগ্রামে

বারবার কেন নির্বাচনে বিপর্যয় হয়? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর গুরুর অদৃশ্য ইঙ্গিতে করিৎকর্মা ইনামুল হক দানু সবাইকে হতবাক করে দিয়ে লতিফের কাছ থেকে মাইক কেড়ে নেন। পরে লতিফকে তার অর্ধসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে দেয়া হয়নি। লতিফও কোন প্রতিবাদ না করে মঞ্চের একপাশে মন খারাপ করে বসে থাকেন। এ ঘটনায় জনসভায় উপস্থিত লতিফের হাজার হাজার সমর্থক ক্ষোভ প্রকাশ করে স্লোগান দেন। কৌশলে অপদস্থ করে দমিয়ে রাখার সব অপচেষ্টা ও বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে লতিফও বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ায় দানু ও গুরুর কূটচাল কোন কাজেই লাগলো না। শেখ হাসিনার জনসভায় নূরুল ইসলাম বিএসসির পক্ষে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো একের পর এক বড় মিছিল আসতে থাকলেও সভা পরিচালনাকারী দানু একটিবার ভুলেও এসব মিছিলকে স্বাগত জানাননি। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন মেয়রের গুণগানে।

চট্টগ্রাম-৭ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী) আসনে মেয়রের পছন্দের প্রার্থী ছিলেন আরেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবদুচ ছালাম। কিন্তু এ আসনটি জোটের শরীক জাসদকে ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে নৌকা প্রতীকে প্রার্থী হন মঈনুদ্দিন খান বাদল। মেয়র এটিও মেনে নিতে পারেননি। বাদলের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করতে থাকেন। বলতে থাকেন, নৌকা পেয়ে বাদল বড় হয়ে গেছেন। তারপরও বাদল জিতেছেন বিপুল ভোটে।

চট্টগ্রাম-৯ (ডবলমুরিং-পাহাড়তলী) আসনে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পার্টির মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহীমকে মনোনয়ন দেয়া হলেও নৌকা প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে মাঠে থাকেন নগর আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আফসারুল আমিন। লালদীঘি ময়দানে শেখ হাসিনার বিশাল সমাবেশে মহাজোট প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলেও এ আসনের কাউকেই পরিচয় করানো হয়নি। এ অবস্থায় ভোটের ময়দানে কঠিন লড়াইয়ে যখন ডা. আফসারুল আমিন ব্যস্ত তখন ওই রাতে মেয়র জাপা প্রার্থীর বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন তা স্থানীয় পত্রিকায় খবর হিসেবে ছবিসহ প্রকাশ করা হলে ভোটারদের মাঝে দেখা দেয় নানা বিভ্রান্তি। এ ঘটনায় ডা. আফসার ও তার সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হন মেয়রের উপর। এতসব কিছুর পরও ডা. আফসারুল আমিন নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানকে হারিয়ে। এখানে জাপা প্রার্থী সামান্য ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন। মেয়র নিজের দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করলেও সবচেয়ে বেশি আন্তরিকভাবে সক্রিয় ছিলেন চট্টগ্রাম-৪ (হাটহাজারী) আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের পক্ষে। মেয়রপত্নীও তার জন্য চালিয়েছেন গণসংযোগ।

এবার চট্টগ্রামে একটি আসন বেড়ে হয়েছে ১৬টি। এর মধ্যে মহাজোট প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ১১টি আসনে। বিএনপির দুর্গে আঘাত হেনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৯টি আসন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও চেষ্টায় জিতে এসেছেন। দলের নেতাকর্মীদের মতে, মহিউদ্দিন চৌধুরী যেবার নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় থাকেন সেবার ফলাফল হয়

নেতিবাচক। এবার মেয়র সক্রিয় না থাকায় ফলাফল হয়েছে আশাতীত ভালো। নেতাকর্মীদের অভিযোগ, মহিউদ্দিন চৌধুরি জীবনে কখনোও 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে জিততে পারেননি। মেয়র নির্বাচনে তার মার্কা ছিল 'হারিকেন'। তিনি তার মেয়রপদকে ঝামেলামুক্ত রাখতে তাই বিএনপি-জামায়াতসহ সবার সঙ্গে সবসময় করে এসেছেন গভীর আঁতাত। তার এই আঁতাতের রাজনীতির বলি হয়েছে দল ও দলীয় নেতৃবৃন্দ। এবারের ফলাফলে তার সেই আঁতাতের রাজনীতিতে হয়েছে প্রত্যাখ্যাত আর মেয়র নিজে হয়ে পড়েছেন প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়।

আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মণ্ডলীরসদস্য সাবেক মন্ত্রী এমএ মান্নান '৯৬ সালে কোতোয়ালি আসনে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার মনঃপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন বিএসসির পক্ষে। চট্টগ্রামের ফলাফল সম্পর্কে তিনি জানান, দলীয় সভানেত্রী দিনবদলের যে সনদ ঘোষণা করেছেন তাতে তরুণ ভোটাররা উজ্জীবিত হয়েছেন। তাই চট্টগ্রামের মতো সারাদেশেও আশাতীত ফলাফল এসেছে। এটাকে তিনি তারুণ্যের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এবার আমাদের প্রার্থী মনোনয়ন সঠিক ছিল। ভোটারদের কাছে ছিল তাদের গ্রহণযোগ্যতা। যা প্রতিপক্ষের ছিল না। চট্টগ্রাম-১০ আসন থেকে নির্বাচিত চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি এমএ লতিফ বলেন, মানুষ আসলে পরিবর্তন চায়, ব্যক্তি নয়, গুণগত পরিবর্তন। আর ব্যক্তিপূজা কেউ এখন পছন্দ করে না। আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে জনকল্যাণে কাজ করার ব্রত থাকলে কোন ব্যক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। প্রতিটি দলেই কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক গ্রুপ থাকে, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের সবাই জানে। এবারের নির্বাচনে মেয়র মহিউদ্দিনের বিরোধিতা এবং তার পক্ষে না নামার পরও বিজয়ী হওয়া প্রসঙ্গে এম এ লতিফ বলেন, নির্বাচনী মাঠে আমি কারও কোন অভাব অনুভব করিনি।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ চট্টগ্রামে এবার আওয়ামী লীগের আশাতীত সাফল্য পাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন, মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। তাছাড়া মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী নির্বাচনী প্রচারণায় নিষ্ক্রিয় থাকাটা সব প্রার্থীর জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। কারণ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মেয়র তার নিজের আগের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। এ নির্বাচনে বিতর্কিত ভূমিকার মাধ্যমে তার একক কর্তৃত্বের অবসান হল।

মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম চৌধুরী দলীয় প্রার্থীদের বিপক্ষে মেয়রের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেন, জনতার জোয়ারের বিপক্ষে যেই থাক না কেন তাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। চট্টগ্রামে তা প্রমাণিত হয়েছে। অনেক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী নেতার বিরোধিতার পরও মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন এখানে ব্যক্তিতন্ত্রের চর্চা চলবে না। ধামাধরা নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। নতুনদের জন্য দিন বদলের জন্য এগিয়ে যেতে না পারলে টিকে থাকা দায় হবে।

- **দুর্নীতি**

  পেশাদার সাংবাদিকরা কখনই ঘুষ বা কোনো উপহার গ্রহণ করেন না। ভালো সাংবাদিক কখনই বিক্রি হন না। তাঁরা কখনই রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সুবিধা গ্রহণ করেন না।

সাংবাদিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য এই মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হয়। যে-কোনো নির্ভরযোগ্য রিপোর্টিংকে অবশ্যই নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল হতে হয়। নির্বাচনসংক্রান্ত সংবাদের জন্য তথ্য সংগ্রহ, সংবাদ লিখন ও সম্পাদনাসহ সকল পর্যায়ে একজন আদর্শ সাংবাদিককে এই মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হয়।

বিশিষ্ট মানবাধিকার সংগঠক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, ২০০৫ সালের মেয়রনির্বাচনের আগে মনে হয়েছিল চট্টগ্রাম আর মহিউদ্দিন চৌধুরী একাকার। পরে সে মর্যাদা তিনি রাখতে পারেননি। এবার সংসদ নির্বাচনে যে দায়িত্ব তার পালন করার কথা ছিল তা পালন না করায় তিনি পূর্বাবস্থান হারিয়েছেন। নিজের দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তার নেতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও যেভাবে চট্টগ্রামবাসী তা আমলে না নিয়ে রায় দিয়েছে, তা মেয়র মহিউদ্দিনের জন্য সতর্ক সংকেত। মানুষ তার ভূমিকাকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। সার্বিকভাবেই তিনি চট্টগ্রামে নিজের নিয়ন্ত্রণ হয় হারিয়ে ফেলেছেন, নয় হারিয়ে ফেলার পথে। চট্টগ্রামবাসীর দুর্ভাগ্য, ৩৭ বছরে তিলে তিলে মহিউদ্দিন চৌধুরীর মত একজন রাজনীতিবিদ গড়ে তুললেও নিজের দোষে কিংবা তার অসৎ পরামর্শকদের দোষে সেই ইমেজ ধরে রাখতে পারলেন না।

এ রিপোর্টটি ব্যাপকমাত্রায় পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি কীভাবে একক আধিপত্য ও কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার কোনো ব্যাখ্যা রিপোর্টে নেই। এখানে অভিযুক্তের ও তাঁর সহযোগীদের কোনো বক্তব্য নেয়া হয়নি। এমনকি বক্তব্য নেয়ার কোনো চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, তারও কোনো উল্লেখ নেই রিপোর্টে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'বৃহত্তর চট্টগ্রামে দলমত নির্বিশেষে মানুষের আলোচনায় এখন এ কথাটিই উঠে আসছে যে, মেয়র তাঁর গদি রক্ষা করতে যে-কোনো ধরনের আপসকামিতা এবং একক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দলীয় নেতৃত্ব যাতে বিকাশ হতে না পারে সেজন্য নেতিবাচক তৎপরতা চালাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থানকেই নড়বড়ে করে ফেলেছেন।' রিপোর্টে শুধু তাঁর দলীয় প্রতিপক্ষ কয়েকজনের বক্তব্য ছাপা হয়েছে। সর্বস্তর কিংবা সাধারণ ভোটারদের কোনো প্রতিক্রিয়া রিপোর্টে ছিল না।

রিপোর্টটিতে উল্লিখিত অভিযোগগুলো প্রমাণের পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ছিল না। তা ছাড়া অভিযোগগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগকারী এবং তাঁদের পরিচিতিও তুলে ধরা হয়নি। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে রিপোর্টটি মানহানিকর। কারণ যথাযোগ্য প্রমাণ ছাড়া বিদ্বেষমূলক প্রতিবেদন ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে পড়ে।

আদর্শ সাংবাদিকতার একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি হলো শালীনতা ও সন্দেহাতীত তদন্তের পর তথ্য উপস্থাপন করতে হবে, জোরপূর্বক কোনো সিদ্ধান্ত রিপোর্টে তুলে ধরা যাবে না। এ রিপোর্টের ক্ষেত্রে এই নীতিটি মানা হয়নি।

অধ্যায় ৫

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন রিপোর্টিং : সূত্র ও কৌশল

- অনলাইন বা ইলেকট্রনিক সূত্র
- নথিপত্র
- মানবীয় সূত্র
- পর্যবেক্ষণ

নির্বাচন রিপোর্টিং : সূত্র ও কৌশল

অন্য যে-কোনো ধরনের রিপোর্টিংয়ের মতো নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে প্রতিবেদকের প্রধান কাজ হলো প্রাসঙ্গিক তথ্য জোগাড় করা। এক্ষেত্রে একজন রিপোর্টার তথ্যের প্রতি যতটা মনোযোগী হবেন ততই তার রিপোর্টটি ভালো হবে। নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে পটভূমিমূলক তথ্য জোগাড়ের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদকের কাজ শুরু হয়। পটভূমিমূলক পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে একটি ভালো নির্বাচনী রিপোর্ট করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাকে কিছুটা গবেষণা করতে হয়। ধরুন, কোনো প্রতিবেদক কোনো নির্বাচনী এলাকার সুনির্দিষ্ট একটি সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করতে চান। সেক্ষেত্রে এ সমস্যাটি সম্পর্কে আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল কি না, কোন কোন প্রার্থী আগে এ সমস্যা নিয়ে কী বলেছিল ইত্যাদি জানতে হয়। পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া রিপোর্টারের পক্ষে এক্ষেত্রে ঘটনা বা বিষয়ের নতুন দিক বের করা সম্ভব হয় না। তিনটি সূত্র থেকে এ ধরনের পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ করা যায় : ইন্টারনেট, প্রকাশিত নথিপত্র ও মানবীয় সূত্র।

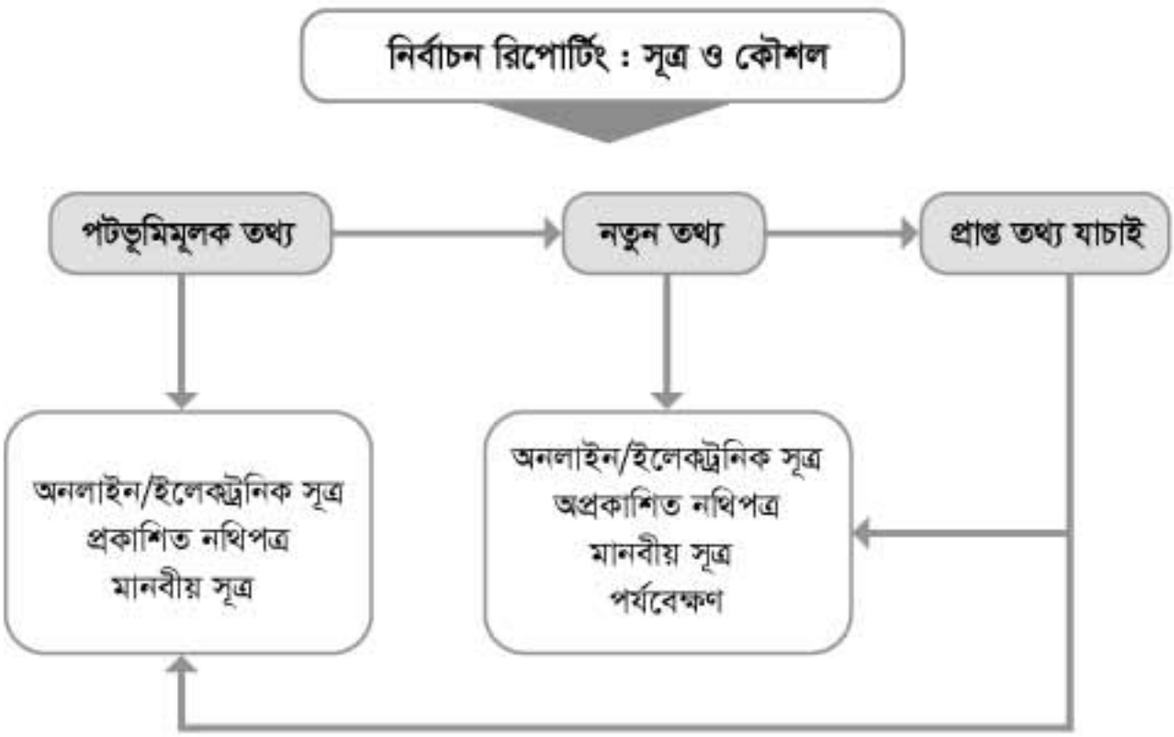

সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলোকে সংক্ষেপে '3P-T' বলা হয়। এগুলো হলো – People, Paper, Place ও Technology। অর্থাৎ প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট, মানবীয় সূত্র, নথিপত্র ও ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন।

অনলাইন বা ইলেকট্রনিক সূত্র

বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতায় পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টারনেট একটি বহুল ব্যবহৃত হাতিয়ার। মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেট একটি বিশাল তথ্যভান্ডার। সে কারণে ইন্টারনেট থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য খুঁজতে হলে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ করা দরকার। কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য একটি সার্চ পরিকল্পনা তৈরি করে সার্চিংয়ের জন্য একটি উপযুক্ত সার্চ ইঞ্জিন নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে রিপোর্টাররা দুই ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তা নিতে পারেন :

১. Crawler-based সার্চ ইঞ্জিন; যেমন : www.google.com, www.yahoo.com

২. Human-powered directories; যেমন, Open Directory- dmoz.org

অনলাইনে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য 'কিওয়ার্ড' লিখে সার্চ দিতে হয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কিওয়ার্ড না লিখলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। একাধিক কিওয়ার্ড থাকলে সেগুলো পরপর লিখে সার্চ দিতে হবে। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেয়া যায়। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইটের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো :

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন – http://www.ecs.gov.bd/

২. আইন মন্ত্রণালয় – http://bdlaws.minlaw.gov.bd/

৩. সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক – https://shujan.org/

৪. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই)– https://www.ndi.org/asia/bangladesh

৫. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ – http://albd.org/bn/

৬. বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি) – http://www.bnpbangladesh.com/

নথিপত্র

নথিপত্র ছাড়া একটি ভালো গভীরতম নির্বাচনী প্রতিবেদন রচনা করা সম্ভব নয়। যথাযথ নথিপত্র একটি রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। নথিপত্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি স্পষ্ট এবং এটি মানবীয় সূত্রের মতো কোনো চাপে পড়ে নিজের অবস্থান পালটে ফেলে না – *Unlike a human source, a document does not change its mind; it cannot deny or alter what it states.* (Coronel, 2009, p. 55)। তবে নথিপত্র বলতে শুধু প্রকাশিত রেকর্ডকেই বোঝায় না। ফাইল, রেকর্ড, চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকারনামা, স্মারক, রসিদ, আদেশনামা ও চিঠিপত্র সহ যে-কোনো লিখিত দলিলের পাশাপাশি অডিও-ভিডিও টেপ, ছবি, ফিল্ম, কম্পিউটার ডিস্ক ইত্যাদিও নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নথিপত্র ছাড়া রিপোর্ট করলে অনেক সময় তা আইনের চোখে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। বিশেষ করে, কোনো ধরনের অভিযোগ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণের সবচেয়ে বড় উপায় হলো নথিপত্রের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা।

উৎস বা সূত্রের দিক থেকে নথিপত্রকে দুভাগে ভাগ করা যায় : প্রাইমারি সোর্স বা অপ্রকাশিত নথিপত্র এবং সেকেন্ডারি সোর্স বা প্রকাশিত নথিপত্র। নতুন বা অপ্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করাই একজন রিপোর্টারের মূল লক্ষ্য। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে অপ্রকাশিত নথিপত্রই রিপোর্টারদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এখান থেকে রিপোর্টাররা নতুন প্রকাশযোগ্য তথ্য পেয়ে থাকেন। তবে শুধু নতুন তথ্য দিয়ে অনেক সময় ভালো রিপোর্ট করা যায় না। এর জন্য ঘটনা বা বিষয়সংশ্লিষ্ট পটভূমিমূলক তথ্য দরকার হয়। একটি ভালো গভীরতম প্রতিবেদন তৈরির জন্য রিপোর্টারকে যে গবেষণা করতে হয় তার প্রধান হাতিয়ার হলো এ ধরনের নথিপত্র। এ ধরনের নথিপত্রকে বলা হয় প্রকাশিত নথিপত্র বা সেকেন্ডারি সোর্স। যেমন, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহার প্রকাশ করে থাকে যেখানে দলের আদর্শ ও লক্ষ্যের পাশাপাশি নির্বাচিত হলে তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরা হয়। সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো সংবাদ সম্মেলন করে ইশতেহার প্রকাশ করে থাকে। কোনো সাংবাদিক যদি সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য ও ইশতেহারের সমন্বয়ে রিপোর্ট করেন, তাহলে সেটি খুবই সাদামাটা একটি রিপোর্ট হবে। তিনি যদি রাজনৈতিক দলটির আগেকার ইশতেহারগুলো পড়ে নেন এবং সেখানে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা পূরণ করেছে তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারেন, তাহলে ভোটারদের পক্ষে দলটি ও দলটির দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করানো সম্ভব হয়। আবার ধরা যাক, কোনো প্রতিবেদক কোনো প্রার্থীর হলফনামা থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে রিপোর্ট করবেন। এক্ষেত্রে তাঁকে ওই প্রার্থীর অতীতে দাখিলকৃত হলফনামা এবং সেখান থেকে তাঁর সম্পত্তির অতীত রেকর্ডগুলো খুঁজে বের করতে হবে। অন্যথায় সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে ব্যবহৃত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত নথিপত্রের কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো :

প্রকাশিত নথিপত্র	অপ্রকাশিত নথিপত্র
অতীতের নির্বাচনী ইশতেহার	নতুন নির্বাচনী ইশতেহার
হলফনামা (পুরাতন)	হলফনামা (নতুন)
নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের হিসাব (পুরাতন)	নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের হিসাব (নতুন)
ভোটার তালিকা (পুরাতন)	ভোটার তালিকা (সর্বশেষ)
নির্বাচনী এলাকার সীমানা (পুরাতন)	নির্বাচনী এলাকার সীমানা (সর্বশেষ)
নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান (পুরাতন)	নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান (নতুন ও সর্বশেষ সংশোধনীসহ)
সরকারি নথিপত্র (অপ্রকাশিত)	সরকারি নথিপত্র (প্রকাশিত)
প্রার্থীর জীবনী	প্রার্থী সম্পর্কিত অপ্রকাশিত কোনো দলিল
দলীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত দলিল	দলের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ও বিধি

প্রকাশিত নথিপত্র	অপ্রকাশিত নথিপত্র
নির্বাচন কমিশনের আদেশ (পুরাতন)	নির্বাচন কমিশনের আদেশ (নতুন)
পুরাতন মামলার কাগজপত্র	মামলার কাগজপত্র (নতুন)
প্রকাশিত রায়ের কাগজপত্র (পুরাতন)	রায়ের কাগজপত্র (নতুন)
নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার পূর্বেকার রিপোর্ট	নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার নতুন প্রতিবেদন
অতীতের নির্বাচনী ফলাফলের গেজেট	নির্বাচনী ফলাফলের গেজেট (বর্তমান)

তবে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত যে ধরনের নথিপত্র হোক না কেন, তা যাচাই-বাছাই না করে প্রকাশ করা যাবে না। মানবীয় সূত্রের জন্য নথিপত্র বেশি বিশ্বাসযোগ্য হলেও মনে রাখতে হবে নথিপত্রে ভুল থাকতে পারে। অর্থাৎ এটি কখনই শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য হবে, এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না। কারণ যে সূত্র থেকে আপনি নথিপত্রটি সংগ্রহ করছেন, তিনি নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বা খণ্ডিত অথবা অসম্পূর্ণ নথিপত্র সরবরাহ করতে পারেন। সেজন্য নথি/রেকর্ড যাচাইয়ের জন্য প্রতিবেদককে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয় (ফেরদৌস, চৌধুরী ও হক, ২০১৫, পৃ. ১১৯-১২০) :

১. নথিপত্রের রচয়িতা কে? তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কি?

২. নথিপত্রটি কি যাচাইকৃত বা যাচাইযোগ্য?

৩. নথিটি কি নির্ভুল? এখানে উল্লিখিত তারিখ, নাম, সংখ্যা ইত্যাদিতে কি কোনো গরমিল আছে?

৪. নথিটি কি সাম্প্রতিক?

৫. নথিটিতে কি এমন কোনো মতামত আছে, যা কোনো পক্ষকে বিশেষভাবে সমর্থন করে?

মানবীয়/ব্যক্তি সূত্র

যে-কোনো সংবাদ প্রতিবেদনের মুখ্য উপাদান হলো তথ্য। আর তথ্যের সবচেয়ে বড় উৎস হলো মানবীয়/ব্যক্তি সূত্র বা সোর্স। কোনো রিপোর্টার সূত্র ছাড়া কাজ করতে পারে না। যার যত বেশি ভালো সোর্স থাকে সে রিপোর্টার তত বেশি তথ্য পান। Richard Keeble বলেছেন, *At the heart of journalism lies the source. Becoming a journalist to a great extent means developing sources* (2006, p. 51)। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, সাংবাদিকরা পরোক্ষ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেন – *Journalists are becoming more passive, often merely passing on information to the public that they have been given.* (O'Neill & O'Connor, 2008, pp. 497-498)। সেজন্য সাংবাদিক কী ভাবছেন সেটি সংবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তার সোর্স বা সূত্র কী বলছে তার ভিত্তিতেই প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় – *Sources make the news* (Sigal, 1986, p. 29)। সংবাদের কাঠামো বা

রূপরেখা তৈরি করে সোর্সের দেয়া তথ্য-উপাত্ত – *News becomes a construction, and the interaction of reporters and sources is how that construction comes to be* (Williams, 1978, p. 64)।

ব্যক্তি সূত্র ছাড়া নির্বাচনী রিপোর্টিং করা সম্ভব নয়। এখানে যত বেশি এ ধরনের সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন, ততই একজন প্রতিবেদক ভালো তথ্য পাবেন এবং তার ভিত্তিতে ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। মানবীয় সূত্রের উল্লেখ ছাড়া কোনো প্রতিবেদনকে পাঠক-উপযোগী করে তোলা যায় না। একটি নির্বাচনী প্রতিবেদনে কারা কারা মানবীয় সূত্র হতে পারে সেটি নির্ভর করবে ওই ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে কারা কারা সংশ্লিষ্ট তার ওপর। যেমন, রাজনীতিবিদ/নেতা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, মুখপাত্র, প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট, ভোটার, ভুক্তভোগী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ (রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার), সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থা/দলের প্রতিনিধি, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি প্রতিনিধি ইত্যাদি।

মানবীয় সূত্রের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে – সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই। অর্থাৎ সূত্রের দেয়া তথ্য ক্রসচেক বা যাচাই-বাছাইয়ের পর তার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে। কোনোভাবেই শুধু একক কোনো সূত্রের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে না। এতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকবেই – *The good reporter is able to ... find at least two good stories during a twopenny bus ride* (Harcup, 2005, p. 47)।

পর্যবেক্ষণ

নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে তথ্যের উৎস বা হাতিয়ার হিসেবে পর্যবেক্ষণ বহুল ব্যবহৃত। ব্যক্তিগত বা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদক নিজেই মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সাংবাদিকতা হলো একটি প্রায়োগিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যা বা বিজ্ঞান, যা সত্যের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞানের 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' নীতিমালার আলোকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় সত্যানুসন্ধান করা হয়। সত্যানুসন্ধানের মৌলিক একটি ভিত্তি হলো পর্যক্ষেণ। যে-কোনো লেখককে ভালো পর্যবেক্ষক হতে হয় – *To write well, first see well* (Yates, 2017)। ভালো পর্যবেক্ষণ নির্ভরশীল দুটি বিষয়ের ওপর – মনোযোগ ও বিশ্লেষণ। একজন প্রতিবেদককে কোনো কিছু শুধু দেখার জন্য দেখলে হয় না, তাকে তা খতিয়ে দেখতে হয়। একজন সাধারণ মানুষ মৌমাছির উড়ে যাওয়া দেখে, একজন সাংবাদিক দেখে কীভাবে তারা উড়ে গেল। নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে পর্যবেক্ষণ দক্ষতা একটি ঘটনার রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ভালো রিপোর্টারা তাদের চোখ, কান, নোটবুক ও টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করে। তাদেরকে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল তথ্যের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করতে হয়। একটি জনসমাবেশ অনেক রিপোর্টার কাভার করেন। কিন্তু একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান রিপোর্টার অস্বাভাবিক কী ঘটছে তার দিকে খেয়াল রাখেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কল্পনাশক্তি নয় বরং ভালো পর্যবেক্ষণ দক্ষতাই রিপোর্টের

অন্যতম প্রধান অস্ত্র – Writers are verbal creatures. But they must observe vividly. Good writers write after the fact, not from inspiration. They write what they have seen – and what they have seen *well!* (Yates, 2017)। একজন রিপোর্টারকে কোনো ঘটনা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হলো :

১. ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা

২. ঘটনার অজানা দিক খোঁজ করা

৩. চোখ, কান খোলা রেখে দ্বিমুখী মন নিয়ে তথ্য খোঁজা

৪. পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ নোট নেয়া

৫. কোনো পক্ষাবলম্বন না করা এবং

৬. পর্যবেক্ষণকৃত বিষয় সম্পর্কে অন্যদের মতামত জানা।

অধ্যায় ৬

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

- নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহ
- পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি
- অফিসের প্রস্তুতি
- রিপোর্টারের প্রস্তুতি
- সংবাদকক্ষের স্মরণচিহ্ন

নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহ

নির্বাচন রিপোর্টিং একদিনে শুরু বা শেষ করা যায় না। এটি একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে একজন রিপোর্টারকে অসংখ্য রিপোর্ট করতে হয়, প্রচুর ঘটনা ও ইস্যুর ব্যাখ্যা পাঠক/দর্শকের সামনে তুলে ধরতে হয়। মূলত নির্বাচনকালীন সরকার এবং তফসিল ঘোষণার শুরু থেকে নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের মৌসুম পুরোপুরি শুরু হয়ে যায়। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তার ভিত্তিতে নির্বাচন রিপোর্টিং বা কাভারেজকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়।

১. প্রাক-নির্বাচনী কাভারেজ/রিপোর্টিং

২. নির্বাচনকালীন কাভারেজ/রিপোর্টিং

৩. নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজ/রিপোর্টিং

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

ভালো নির্বাচন রিপোর্টিং করার প্রধান মূল মন্ত্র হলো এ নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনার গুরুত্ব কতটা তা বোঝা যায় B. V. Rao (2011)-এর কথায় – *Even a bad election plan is better than no election plan at all!*

নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। ঘটনা ঘটার পর পরিকল্পনা নেয়ার চেয়ে আগেভাগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবাদ করলে কাজ অনেক সহজ ও সাবলীল হয়। অন্যথায় দল বা প্রার্থী যেসব ইস্যু ব্যাপক আকারে তুলে ধরতে চায় সেগুলোর প্রতিই রিপোর্টারের বেশি আকর্ষণ থাকে। তখন শুধু ঘটনা বা ইস্যুগুলো বেশি করে আলোচিত হওয়ার কারণেই রিপোর্টাররা তা নিয়ে সংবাদ করে থাকে। আগেভাগে নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা থাকলে সংবাদমাধ্যম কী নিয়ে এবং কীভাবে রিপোর্ট করবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে। মনে রাখতে হবে, যেসব প্রার্থী গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ রিপোর্ট প্রত্যাশা করে না, বরং সব সময় চায় যেন তাদের অনুকূলে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়। একটি স্বাধীন নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন করার মানসিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, বা এটি তৈরি থাকে না। গণমাধ্যমের প্রবীণ-নবীন কর্মীদের সমন্বয়ে এ ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিতে হয়। তবে ভালো নির্বাচন কাভারেজের জন্য দরকার প্রস্তুতি। বলা হয়, *There is no ready-made recipe*

for preparing an electoral-coverage plan – but preparation is the most important part of good election coverage. (Brandt, et al., 2006, p. 31)।

নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনা নেয়ার অর্থ হলো একটি গণমাধ্যম তার বিদ্যমান সক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে। একজন রিপোর্টারের যেমন নিজস্ব লক্ষ্য থাকতে পারে, তেমনি সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানেরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। এ লক্ষ্যগুলো নির্বাচন কাভারেজের সঙ্গে জড়িত গণমাধ্যমের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে থমসন ফাউন্ডেশন বলছে, *Elections are a mix of rules and chaos, predictable events and surprises. Make sure to plan early and seriously enough so that you'll be able to address the inevitable rollercoaster and ups and downs of the campaign.* (Marthoz & White, 2013, p. 4)।

নির্বাচন কাভারেজ

পরিকল্পনা ছাড়া সাংবাদিকরা যেসব বিষয়ে সংবাদ করে থাকেন	**পরিকল্পনাসহ** সাংবাদিকরা যেসব বিষয়ে সংবাদ করে থাকেন
দলীয় ইস্যু/ঘটনা	দলীয় কর্মসূচি তুলে ধরে
প্রার্থীর এজেন্ডা	ভোটারদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে
নামিদামি প্রার্থী	ঝুঁকিগুলো কী তা খুঁজে বের করে
দলীয় কৌশল	প্রস্তাবিত সমাধান
মুখপাত্র যা বলেন	নিজস্ব অনুসন্ধান
দলের জনপ্রিয়তা	দলের গুণাবলি
দলের অতীত	দলটি বর্তমানে যা করছে

অফিসের প্রস্তুতি

একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোনো একজন রিপোর্টারের পক্ষে একা কাভার করা সম্ভব নয়। গণমাধ্যমের জন্য ভালো নির্বাচন কাভারেজ নির্ভর করে টিমওয়ার্কের ওপর। সে কারণে এর জন্য রিপোর্টারের নিজস্ব প্রস্তুতির পাশাপাশি অফিসের প্রস্তুতিও দরকার হয়। আপনার অফিসের অবকাঠামো ও সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে নির্বাচন কাভারেজ পরিকল্পনা সাজাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার অফিসে যদি লোকবল কম থাকে এবং অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত না থাকে, তাহলে দেশের সব কটি সংসদীয় আসনে নিউজ করার চেয়ে ভালোভাবে কয়েকটি আসনের ওপর নজর দেয়া উত্তম। তবে একটি ভালো নির্বাচন কাভারেজ পরিকল্পনা ছাড়া টিমওয়ার্ক আশা করা সম্ভব নয় এবং এর মাধ্যমে গণমাধ্যমের যে প্রহরীর ভূমিকা তা পালন করা যায় না। বলা হয়, *Without an electoral plan, you will react to and be drawn along by*

events rather than concentrating on serving the public with good, clear, balanced reports. (Brandt, et al., 2006, p. 30)।

- **স্বতন্ত্র সেল গঠন**

  পুরো সংবাদ বিভাগকে একটি ছাতার মতো কল্পনা করে পরিকল্পনা সাজাতে হয়। প্রত্যেকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র বণ্টন করতে হয়। নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের স্বতন্ত্র একটি সেল গঠন করতে হয়। একজন দলনেতার অধীনে পুরো টিমকে সাজাতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া, সংবাদ সম্পাদনা ও প্রচারের দায়িত্ব তারা বিশেষভাবে পালন করবে।

- **পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন**

  আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নির্বাচন কাভারেজ সংবাদমাধ্যমের রাজনৈতিক ডেস্কের কাজ। সত্যিকার অর্থে এটি রাজনৈতিক ডেস্কের জন্য স্বর্ণালি সময়। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের অন্য বিভাগগুলো তাদের জ্ঞান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্বাচন কাভারেজকে আরও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাংবাদিকরা বিভিন্ন ধরনের বিট কাভার করে থাকেন। যেমন – অপরাধ, অর্থনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বিট ভিত্তিতে অভিজ্ঞ রিপোর্টার দিয়ে পর্যালোচনা করালে অনেক বেশি ভালো রিপোর্ট করানো সম্ভব।

- **বাজেট প্রণয়ন**

  নির্বাচন সংবাদমাধ্যমের জন্য আয়ের উৎস বটে, তবে এ সময় খরচও বেড়ে যায়। বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি, সরঞ্জাম কেনা, পরিবহণসহ অন্যান্য খরচ বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সে কারণে নির্বাচন সামনে রেখে কাভারেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বাজেট প্রণয়ন করা উচিত। নির্দিষ্ট বাজেট পরিকল্পনা না থাকলে যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের কাভারেজ পরিকল্পনা মাঝপথে বা যে-কোনো সময় থমকে যেতে পারে।

- **সম্পাদকীয় প্যানেল তৈরি করা**

  সম্পাদক বা সমপর্যায়ের একজন ব্যক্তি, রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান ও কয়েকজন বিশেষ প্রতিবেদকের সমন্বয়ে এ ধরনের প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে, যারা প্রয়োজন সাপেক্ষে কিংবা স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোতে করণীয় ঠিক করে দেবেন।

- **প্রকাশনা-সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ**

  সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কী ধরনের রিপোর্ট করা হবে, কী ধরনের কলাম ছাপা হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। কী ধরনের, কখন থেকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রেডিও-টিভির ক্ষেত্রে কী ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এটি যে-কোনো নির্বাচন কাভারেজ পরিকল্পনার মৌলিক ভিত্তি।

- **নিয়মিত সম্পাদকীয় বৈঠক**

  নির্বাচন কাভারেজের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় থেকে নিয়মিত সম্পাদকীয় বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। প্রতিদিনকার প্রকাশিতব্য বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

- **গবেষণা সেল**

  নির্বাচনী কাভারেজের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সংবাদমাধ্যম নির্বাচনের অতীত ইতিহাসগুলো সম্পর্কে কতটা ভালো জানে তার ওপর। এ কারণে একটি ভালো গবেষণা সেল থাকা জরুরি। গবেষণা সেলের দক্ষতার ওপর সংবাদমাধ্যমগুলোর নির্বাচন কাভারেজের সাফল্যে পার্থক্য নিরূপণ করে দেয়। এই গবেষণা সেল শুধু পটভূমিমূলক তথ্যই সরবরাহ করে না, বরং তারা নিত্যনতুন আইডিয়াও সংবাদকর্মীদের দিয়ে থাকে। B. V. Rao (2011) বলেছেন, *This is actually the backbone of any election coverage, marking the difference between a good job and an average one.*

- **সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনা**

  সংকটময় বা জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব সময় ব্যাকআপ টিম তৈরি রাখতে হবে।

- **বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ**

  নির্বাচনের সময় নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, জনমত বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা ইস্যুতে বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া দরকার হয়। এ কারণে এসব ব্যক্তির নাম, পরিচিতি, যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

- **প্রযুক্তিগত সুবিধা**

  কী ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা নতুন করে ব্যবস্থা করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। মোট পরিকল্পনায় সরাসরি সম্প্রচারের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা থাকবে, স্টুডিওর ধরন কেমন হবে, মাঠ পর্যায়ের রিপোর্টারদের জন্য কী কী প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে – এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

- **সূচি অনুসরণ করা**

  নিয়মিত ডায়ারি বা সূচি অনুযায়ী কাজ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া।

- **সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমা**

  মাঠ পর্যায়ে যেসব সাংবাদিক কাজ করবেন তাদের স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য বিমার উদ্যোগ নেয়া।

- **আর্কাইভ সুবিধা**

  নির্বাচন-সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, বই ও প্রকাশনা, অতীতের ফলাফলসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী আর্কাইভ গড়ে তোলা।

- **প্রশিক্ষণ**

  নিজ নিজ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নির্বাচন ইস্যুতে দক্ষ করে তোলার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- **চিত্র সাংবাদিকদের জন্য নির্দেশনা**

  সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফার এবং টেলিভিশনে ভিডিওগ্রাফার/ক্যামেরাপারসন নির্বাচন সংবাদ কাভারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে ছবি ও চিত্র ধারণের জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কাভারের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতি এবং তাদের আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে একটি গাইডলাইন দেয়া যেতে পারে।

সম্পাদকীয় বৈঠক

মুদ্রণ বা সম্প্রচার, যে ধরনের মাধ্যম হোক কেন, ভালো ও মানসম্মত নির্বাচন কাভারেজের জন্য নিয়মিত সম্পাদকীয় বৈঠকের প্রয়োজন আছে। একটি নির্দিষ্ট দিনে রিপোর্টাররা কী ধরনের সংবাদ করবেন, কীভাবে করবেন এবং কেন এসব সংবাদ করবে, ইত্যাদি বিষয়ে এসব বৈঠকে আলোচনা হয়। রিপোর্টরা এসব বৈঠকে তাদের আইডিয়াগুলো জানাবেন। বার্তা সম্পাদকসহ ডেস্কের উর্ধ্বতন সহকর্মীরা রিপোর্টারদের আরও আইডিয়া দেবেন। এসব বৈঠকে নিজেদের আইডিয়া সম্পর্কে কথা বলার জন্য রিপোর্টারদের আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। একটি আইডিয়া একটি সংবাদ নিয়ে কথা বলবে, কোনো ইস্যু নিয়ে নয়। যেমন, ইস্যু হলো অপরাধ, কিন্তু কথা হবে 'ভোটাররা পুলিশকে ফোন দিতে ভয় পাচ্ছে' – এই সংবাদ নিয়ে। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে দিনের সংবাদ পরিকল্পনার একটি তালিকা তৈরি হয় এ ধরনের বৈঠকে এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সংবাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। কম গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়াগুলো অন্য দিনের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

রিপোর্টারের প্রস্তুতি

একটি নির্বাচন কাভারেজের জন্য রিপোর্টার ও সাংবাদিকরাই একটি সংবাদ – প্রতিষ্ঠানের মূল অস্ত্র। সেজন্য সাংবাদিকদের প্রস্তুতির ওপরই নির্ভর করে একটি গণমাধ্যমের ভালো নির্বাচন কাভারেজের সাফল্য।

- এখানে তিনটি ধাপ আছে : নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী। প্রচার শুরুর আগেই অতীতের সব তথ্য-উপাত্ত সাংবাদিককে জোগাড় করতে হবে। যেমন, গত নির্বাচনে কে কে প্রার্থী ছিল, প্রত্যেক দলের কতজন প্রার্থী ছিল, প্রার্থীদের অতীত, কোন

আসনে কত ভোট পেয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সংবাদপত্র, ইন্টারনেটসহ সম্ভাব্য নানা সূত্র থেকে এসব বিষয়ে সবচেয়ে সাম্প্রতিক তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

- নির্বাচনী প্রচার নিয়ে রিপোর্টিং করার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাংবাদিকদের প্রার্থী ও দলগুলোর অতীত সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে হয়। দল ও প্রার্থীদের ঘোষণা, সংবাদ সম্মেলন ও জনমত জরিপ নিয়ে সুবিবেচনাপ্রসূত ও যত্নের সঙ্গে রিপোর্ট করতে হয়। প্রার্থীদের সম্পর্কে দরকারি গবেষণা ও পড়ালেখা থাকলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রিপোর্টার আগেই পেয়ে যান যেগুলো যথাসময়ে প্রার্থী ও দলের নেতাদের সামনে উত্থাপন করা যায়। জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে এসব প্রশ্ন সাজাতে হয়। মানুষের নিত্যদিনের সমস্যাগুলোকে এখানে প্রাধান্য দিতে হয়। সাংবাদিকরা এসব প্রশ্ন ও ইস্যু প্রার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা এসব বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হন।

- নির্বাচন কাভারেজ শুরু করতে হবে একটি উন্মুক্ত মন নিয়ে। প্রথমেই নির্বাচনী আইন, প্রার্থীদের নাম, তাদের ও দলীয় নেতাদের ফোন নাম্বার জোগাড় করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব ধরনের রিপোর্ট, গবেষণা রিপোর্ট, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

- দলগুলোর সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সংগ্রহ করা। ক্যাম্পেইন অফিস ও পোলিং স্টেশনের ঠিকানা জোগাড় করুন। বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, বিশ্লেষকদের নাম ও ফোন নাম্বার সংগ্রহ করুন। নির্বাচনী প্রচারের সময় ও প্রচার শেষে এসব ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মত ও তথ্য পেতে পারেন।

- অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ও পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র আপডেটেড আছে কি না দেখে নিতে হবে। যদি না থাকে, তাহলে দ্রুত তা করে নিতে হবে। ভোটের দিন দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে পরিচয়পত্র দেয়া হয়, তার উলটো পাশে যেসব নিয়মকানুনের উল্লেখ থাকে সেগুলো ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।

- অফিসে বা সংবাদকক্ষে এমন একটি স্থান বাছাই করুন, যেখানে এসব তথ্য-উপাত্ত রাখতে পারেন এবং নির্বাচন কাভারেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে।

- আজকাল সাংবাদিকতার একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার হলো আধুনিক মোবাইল। অনেকে ছবি তুলে, ধারণ করে তা অফিসে পাঠিয়ে দেন দ্রুত গতিতে, এমনকি ঘটনাস্থল থেকে মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারেও যুক্ত হতে পারেন। একে মোবাইল সাংবাদিকতা বা মোজো বলা হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে রিপোর্টারকে এ ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। তবে ভোটের দিন মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা মেনে চলতে হবে।

সংবাদকক্ষের স্মরণচিহ্ন :
এই তালিকাটি সংবাদকক্ষে টাঙিয়ে দিন

নির্বাচন রিপোর্টিং : আমার সংবাদটি কি পরিপূর্ণ?
প্রত্যেক রিপোর্টার ও সম্পাদকের নির্বাচনী রিপোর্ট করার আগে নিচের প্রশ্নগুলো করা উচিত?

১. সংবাদটি কি নির্ভুল? সংবাদে উল্লিখিত তথ্য ও নামগুলো কি ঠিক আছে? আমি কি বিশ্বাস করি যে এগুলো সত্য? তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি কি সব ধরনের চেষ্টা করেছি?

২. সংবাদটি কি পক্ষপাতহীন ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ? এতে কি উভয় পক্ষের ভাষ্য আছে কিংবা বিকল্প মত আছে? এ সংবাদটি কি কোনো প্রার্থী বা দলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না করেই করা হয়েছে?

৩. এটি কি দায়িত্ববান সাংবাদিকতা? কোনো ধরনের ঘুষ বা অনৈতিক পদক্ষেপ ছাড়াই কি এ সংবাদটি করা হয়েছে? এতে কি সূত্রের সুরক্ষা আছে? এ রিপোর্টে নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধান ভঙ্গ করা হয়নি তো?

৪. এ সংবাদটি কি ভোটারদের কেন্দ্র করে করা হয়েছে? এখানে কি ভোটারদের জন্য উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে? এখানে কি ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে?

৫. এই সংবাদে কি পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে? এ রিপোর্টে ব্যবহৃত শব্দ, ছবি, বক্তব্য কি পুরো ঘটনাকে তুলে ধরতে সক্ষম?

৬. এ সংবাদ কি ভোটারদের ভালোভাবে তথ্য জানাতে সক্ষম হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় বিচক্ষণতার সঙ্গে ভোট দিতে পারেন?

৭. এই নির্বাচনটি কি অবাধ ও নিরপেক্ষ? এই নির্বাচন-সম্পর্কিত অন্য কোনো সংবাদ কি আছে যেটি করা উচিত?

অধ্যায় ৭

এ অধ্যায়ে থাকছে

প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিং

- নির্বাচন কমিশন
- নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃর্নির্ধারণ
- ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ
- রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন
- ভোট গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন
- নির্বাচনকালীন সরকার

প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিং

সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পরপর এদেশে সংসদ নির্বাচন হয়। কিন্তু সারা বছর ধরে চলা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য থাকে নির্বাচন। এদেশের প্রধান ও বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় নির্বাচনকে ঘিরে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া তাই হঠাৎ করে এক দিনে শুরু হয়ে এক দিনেই শেষ হয়ে যায় না। নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন পরবর্তী নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রুটিন ওয়ার্ক যেমন থাকে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ আইন সংশোধন থেকে শুরু করে বিশেষ উদ্যোগও থাকতে পারে। এসব কর্মকাণ্ড একজন রিপোর্টারকে কাভার করতে হয়, এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট করে পাঠক/দর্শককে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে হয়।

সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত যে রিপোর্টিং তাকে প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিং বলা যায়। একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দেশে তিন থেকে চার বছর পার হলে নির্বাচনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়। তবে এর আগে নির্বাচনসংক্রান্ত নানা কাজ বিভিন্ন সংস্থা করতে পারে। এসব কাজ কখন করবে বা করতে হবে সে বিষয়ে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। তবে অবশ্যই এসব কাজ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে করতে হয়। মূলত রাজনৈতিক ও নির্বাচন কমিশনের বিটের রিপোর্টাররা প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের বিষয় বা ক্ষেত্রগুলো নিয়ে রিপোর্ট করে থাকে।

প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রসমূহ

প্রাক-নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ে যেসব বিষয় বা ক্ষেত্র নিয়ে রিপোর্ট করা হয় সেগুলো হলো :

১. নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তথ্যের একটি প্রধান উৎস নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। নির্বাচন কমিশন হলো একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আইনকানুন প্রণয়ন করে। কিন্তু অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের গঠন কাঠামো, ক্ষমতা, কার্যাবলি, পরিধি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সম্যক ধারণা থাকতে হয়। আবার নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছতার মডেল হতে হয়। নির্বাচনী কমিশনের সকল কাজ গণমাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ক. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। আমাদের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা আছে। সংবিধানের

১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন দায়িত্ব (এর মধ্যে নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন ও প্রদান করাসহ সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ, যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত) এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদির সুষ্ঠু সম্পাদন। দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন থাকবে এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবে। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এর ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

খ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কোনো নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এজন্য ২০০৯ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনও প্রণীত হয়েছে (আইনটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ নামে পরিচিত হলেও ২০০৮ সালের ৯ মার্চ থেকে এটি কার্যকর বলে গণ্য হবে)। এই আইনের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বগুলো হলো :

- সকল জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরি করা
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা
- রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন পরিচালনাসহ উপনির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠান
- ভোট গ্রহণের জন্য সারা দেশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও সরকারি গেজেট প্রকাশ
- নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ ও সংরক্ষণ
- প্রত্যেক নির্বাচনের আগে সারা দেশে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্বাচনী কর্মকর্তা, যেমন – রিটার্নিং, সহকারী রিটার্নিং, প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা
- ব্যালট পেপার ছাপানো ও সরবরাহ করা

- ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত সকল মালামাল সংগ্রহ ও রিটার্নিং অফিসারের কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, গণভোট এবং স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহ ও প্রেরণসংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ
- প্রত্যেক নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা
- গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহ এবং একত্রীকরণ
- প্রত্যেক নির্বাচনের ব্যাপারে সামগ্রিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা
- রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন এবং এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনবলকাঠামো অনুযায়ী (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন : অর্গানোগ্রাম, ২০১৮) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনবল হচ্ছে ৩৩১, আর মাঠ পর্যায়ের অফিসের জনবল হলো ২৩৮২ জন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব, তিনজন যুগ্মসচিব, আটজন উপসচিব, ১৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং আটজন সহকারী সচিব আছেন। ভালো রিপোর্ট করার জন্য একজন সাংবাদিককে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যে-কোনো পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকতে হয় এবং জানতে হয় একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কী কী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশনের কাজ

একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা নিচে দেয়া হলো :

- আইন সংস্কার
- রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপ
- জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ
- রাজনৈতিক দল নিবন্ধন
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ
- আন্তমন্ত্রণালয় সভা
- নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা
- রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ
- ভোটকেন্দ্র স্থাপন
- পোলিং পারসোনেলের প্যানেল
- মনোনয়নপত্র বাতিল/গ্রহণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের কার্যক্রম
- আচরণ বিধিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কি না, তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা
- কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি করা
- ব্যালেট পেপারসহ নির্বাচনী মালামাল মুদ্রণসহ বিতরণ/সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণ
- নির্বাচন পরিচালনা তদারক করা
- কেন্দ্রীয়ভাবে ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা

গ. মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

নির্বাচন প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো রিপোর্টারকে মাথায় রাখতে হবে, একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি মহাযজ্ঞ। এর বেশিরভাগ কাজ হয় রাজধানীর বাইরে থেকে। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো এ ধরনের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও সূত্র। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ের জনবল কাঠামো (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন : অর্গানোগ্রাম, ২০১৮) অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় তিন স্তরে বিভক্ত। সেগুলো হলো :

- **আঞ্চলিক পর্যায়**
  সারা দেশে মোট ১০টি আঞ্চলিক নির্বাচনী কার্যালয় আছে। এগুলো হলো : ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও ফরিদপুর। এসব কার্যালয়ে একজন করে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও দুজন করে অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা আছেন। আঞ্চলিক নির্বাচনী কার্যালয়গুলোর মূল দায়িত্ব হলো নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের দফতরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। এ ছাড়া সব ধরনের নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কার্যাবলি, ভোটার নিবন্ধন ও ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বয় সাধন করাও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর কাজ।

- **জেলা পর্যায়**
  দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। সিনিয়র জেলা নির্বাচন ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা ছাপানো, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা, পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নির্বাচনের সময় সকল সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, রিটার্নিং অফিসারদের সম্ভাব্য সব

রকমের সহায়তা প্রদান, পোলিং অফিসারদের ফর্ম, প্যাকেট, ম্যানুয়েল, ব্যালেট পেপার, ব্যালট বাক্স ও ভোটার তালিকা সরবরাহ করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

- **উপজেলা/থানা পর্যায়**

  দেশে বর্তমানে ৫১২টি উপজেলা বা থানা পর্যায়ের নির্বাচনী কার্যালয় রয়েছে। এতে একজন করে কর্মকর্তা আছেন। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের নির্বাচনী অফিসকে নির্বাচনসংক্রান্ত সকল কাজে সহায়তা করা।

ঘ. নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ

একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি বৃহৎ ও ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। নির্বাচন কমিশনের সীমিত জনবল দিয়ে এ কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এ কারণে নির্বাচন কমিশনকে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের যেরূপ জনবলের প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশন দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ জনবল প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কোনো পৃথক নির্বাহী ক্ষমতা না থাকায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তার কার্য সমাধা করেন। ভালো প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাংবাদিকদেরকে অবশ্যই এসব কর্মকর্তার পদবি ও তাঁদের দায়িত্বগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

- রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি জেলার বিপরীতে এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। একটি সংসদীয় এলাকায় রিটার্নিং অফিসারকে সহযোগিতা করেন এক বা একাধিক সহকারী রিটার্নিং অফিসার। রিটার্নিং অফিসার যেসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন সেগুলো হলো :
  - ✓ মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই
  - ✓ ভোটকেন্দ্র স্থাপন
  - ✓ প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও সহকারী পোলিং অফিসার নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ
  - ✓ ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী সামগ্রী প্রেরণ
  - ✓ স্থগিত ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিতকরণ
  - ✓ স্থগিত ভোটকেন্দ্রের পুনরায় ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা
  - ✓ বাতিলকৃত ব্যালেট পেপারগুলো পরীক্ষা করা
  - ✓ কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে সন্তোষজনক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় ব্যালেট পেপার গণনা
  - ✓ ডাকভোট গণনা

- ✓ দুজন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা
- ✓ ব্যবহৃত নির্বাচন সামগ্রী সিল করা
- ✓ সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে রিপোর্ট করার লিখিত অনুমতি প্রদান
- ✓ বেসরকারি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা।

- **প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার**

  একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। প্রিসাইডিং অফিসারকে সহায়তা করার জন্য সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার থাকেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) ১৯৭২-এর (২) ধারা অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করেন। ভোটকেন্দ্রে কোনো সমস্যা হলে সে সম্পর্কে তিনি রিটার্নিং অফিসারকে জানান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে পারেন। আবার ভোটকেন্দ্রে অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য তিনি যে-কোনো ব্যক্তিকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন।

  সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার মূলত ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ভোট গ্রহণ করে থাকেন। ব্যালেট পেপার যথাযথভাবে ভোটারকে ইস্যু করার জন্য ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসই নেয়া ও ব্যালেট পেপারে অফিসিয়াল সিল এবং স্বাক্ষর দিয়ে ভোটারকে দিয়ে প্রদান করেন।

- **পোলিং অফিসার**

  ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেকটি বুথে দুজন করে পোলিং অফিসার থাকেন। তারা ভোটারের পরিচিতি পরীক্ষা করেন এবং ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগান ও ভোটার যেন ব্যালেট পেপার ব্যালেট বাক্সে ফেলেন তা নজর রাখেন।

  সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এসব নিয়োগ স্বচ্ছ কি না, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কি না এবং নিয়োগের পর যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে কি না – এসব বিষয় সাংবাদিকরা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট করতে পারেন।

২. নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃর্নির্ধারণ

নির্বাচনের আগে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নির্বাচন বিটের সাংবাদিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমাদের দেশে আইনগতভাবে সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। তবে বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে 'ডিলিমেটেশন কমিশন', যা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন একটি কমিশন (আহমদ, ২০০৮, পৃ. ১৭৭)।

সংসদের সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিধান অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সবশেষ ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল সীমানা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করেছে। এর আগে সবশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে সীমানায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে একটি আদমশুমারি হলেও ২০১৪ সালের এবং চলতি বছর সীমানা নির্ধারণে তেমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণকালে প্রতিটি এলাকার প্রশাসনিক সুবিধা, এলাকার সংহতি ও জনসংখ্যা বিবেচনায় সীমানা নির্ধারণের কাজ করবে। কিন্তু এ কাজটি কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে আইনে বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা বা গাইডলাইন দেয়া নেই। তবে নির্বাচন কমিশন নীতিমালা তৈরি করে তার ভিত্তিতে কাজটি করে থাকে।

সীমানা নির্ধারণে নির্বাচনের ফল অনেকটাই প্রভাবিত হয়। সে কারণে প্রতিবেদককে সীমানা পুনর্নির্ধারণের সময় খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাজ অনুসরণ করতে হয়। কোনো এলাকার কোনো প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার জন্য ওই এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে কি না, জনসংখ্যার অনুপাতে সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে এলাকার আয়তনকে অবহেলা করা হয়েছে কি না, বিশেষ কোনো দলকে সুবিধা দেয়ার জন্য কোনো গোষ্ঠীর ভোটব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ থাকে এ পর্যায়ে। আবার সীমানা নির্ধারণের পর রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়ে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব।

৩. ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ

যে-কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ভোটার তালিকা। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ এবং নারী-পুরুষভেদে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না। ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুচ্ছেদে বলা আছে, কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন যদি –

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন

খ) তাঁর বয়স আঠারো বছরের কম না হয়

গ) কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁর সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থাকে

ঘ) তিনি ওই নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ওই নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বলে বিবেচিত হন এবং

ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

সংবিধানের এই বিধান এবং সবশেষ প্রণীত ভোটার তালিকা আইন, ২০১২-এর আলোকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। নির্বাচন কমিশন ছয়টি ধাপে কাজ করে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করে (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৮)। প্রতি বছরের ১ জানুয়ারি ১৮ বছর হলেই নাগরিকদের ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বছরের উপযুক্ত সময়ে হালনাগাদ করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ চলে। এ ছাড়া বছরের যে-কোনো সময়ই ভোটারযোগ্যদের নিবন্ধন করা হয়। ভোটার তালিকা সংশোধন ও সংযোজনের এই পর্যায়ে মৃত এবং এলাকায় বসবাস করে না, এমন ব্যক্তিদের নাম বাদ দেয়া হয়। আবার যারা প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ আঠারো বছর যাদের বয়স হয়েছে তারা ভোটার তালিকাভুক্ত হন। এ পর্যায়ে সংবাদকর্মীদের নজরদারি বেশি প্রয়োজন। ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গাফিলতি, রাজনৈতিক দল ও নেতা-কর্মীদের প্রভাবে অযোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর জমা পড়া অভিযোগগুলো আমলে না নেয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে রিপোর্টাররা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে পারেন।

২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সবশেষ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২০১৮)। এ তালিকা অনুযায়ী, আগামী নির্বাচনে ১০ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোট দিতে পারবেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচনের সময় ভোটার ছিল ৯ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৭ জন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচনের সময় দেশে মোট ভোটার ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার।

৪. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হিসেবে চালু করে নির্বাচন কমিশন। প্রথম বছরে ১১৭টি আবেদনের মধ্যে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ৩৯টি দল নিবন্ধন পায়। বর্তমানে ইসির নিবন্ধনে ৪০টি রাজনৈতিক দল রয়েছে (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৮-ক)। স্থায়ী সংশোধিত গঠনতন্ত্র দিতে না পারায় ২০০৯ সালে ফ্রিডম পার্টির নিবন্ধন বাতিল করে কমিশন। আর আদালতের আদেশে ২০১৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ হয়। সবশেষ ২০১৮ সালের নভেম্বরে দলটির নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮-এ রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য কিছু শর্ত দেয়া আছে। এগুলো হলো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে-কোনো জাতীয় নির্বাচনে আগ্রহী দলটিতে অন্তত একজন সংসদ সদস্য থাকেন বা যে-কোনো একটি নির্বাচনে দলের প্রার্থী অংশ নেয়া আসনগুলোয় মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ পায়; অথবা দলটির যদি একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দেশের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ (২১টি) প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর কমিটি ও অন্তত ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থন-সংবলিত দলিল থাকে।

২০০৮ সালের পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনের আগে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন জমা দেয়। কোনো ভুঁইফোঁড় বা নামসর্বস্ব দল নিবন্ধন পাচ্ছে কি না,

নির্বাচন কমিশন কোনো বিশেষ দল বা জোটভুক্ত দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে কি না, নির্বাচন কমিশনের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় ঘাটতি আছে কি না – এসব বিষয় নিয়ে এ পর্যায়ে রিপোর্ট করা যায়।

৫. ভোট গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন

অনেক সময় নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি সংযোজন ও বিয়োজন করে থাকে। ভোট গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনেকখানি জড়িত। এসব ক্ষেত্রে ভোটারদের সচেতনতার জন্য নতুন নিয়ম সম্পর্কে তাদের জানানো রিপোর্টারদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। যেমন, ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরনের ভোটিং মেশিন নিয়ে ভোট গ্রহণ করা হলেও জাতীয় পর্যায়ে এ পদ্ধতির প্রবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এসব মতপার্থক্য তুলে ধরার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নতুন নতুন পদ্ধতির কার্যকারিতা, নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা যাচাই করে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট করা যায়।

৬. নির্বাচনকালীন সরকার

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রতিবার নির্বাচনের আগে আগে নির্বাচনকালীন সরকার এবং সে সরকারের কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা নিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। সে বিতর্ক অতীতে আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল, যার ফলস্বরূপ বহু প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ৫ম, ৭ম, ৮ম ও ৯ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো ৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এ সংসদের মেয়াদকাল ছিল মাত্র কয়েক দিন, গণ-আন্দোলনের চাপে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা হয়েছিল। এরপর এ ব্যবস্থায় তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারির পর গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকার কারণে এই পদ্ধতির দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের দেয়া এক রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। তবে আপিল বিভাগ ওই রায়ে পরবর্তী দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার পরামর্শ দিলেও ৩০ জুন ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। বর্তমানে সংবিধানের বিধান অনুসারে, বিদ্যমান সরকার ক্ষমতায় থাকতেই পরবর্তী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে কারণে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনে নির্বাচন করার বিধান ছিল। এখন পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার বিধান আছে। এই ৯০ দিন সংসদ থাকলেও অধিবেশন বসবে না। সংবিধানের ৫৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অযোগ্য করবে না। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি তার সরকারের মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রেও সংবিধানের একই বিধান। সংবিধানের ৫৮(৪) অনুচ্ছেদে

বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে; তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলি-সাপেক্ষে তাদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।

তবে দশম সংসদ নির্বাচনের আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও জাতীয় পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এতে অংশ নেয়। দশম সংসদ নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যরা ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর শপথ নিয়েছিলেন।

সরকার নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শরিক। বেশ কয়েক দফা নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন এলেও নির্বাচনকালীন সরকারের স্বচ্ছতা ও তাদের কর্মকাণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য একটি নিয়ত বিষয়। সে কারণে প্রতিটি নির্বাচনের আগে এ নিয়ে রাজনীতির মাঠ সরগরম হতে দেখা যায়। নির্বাচন বিটের রিপোর্টারদের এ নিয়ে রিপোর্ট করার পরিকল্পনা মাথায় রাখতে হয়।

নির্বাচনকালীন সরকারের দ্বৈত দায়িত্ব

নির্বাচনী প্রচারের সময় সরকারি প্রতিনিধি দ্বৈত দায়িত্ব পালন করে থাকে। একটি হলো তারা সরকারের প্রতিনিধি অন্যটি হলো আসন্ন নির্বাচনে তারা সরকারি দলের প্রার্থী। এ দ্বৈত দায়িত্ব দুটি দিক থেকে সমস্যা তৈরি করে :

- প্রত্যেক প্রার্থীর সমান সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে।
- প্রত্যেক প্রার্থীর সম-ট্রিটমেন্ট না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী সরকারি অনেক কর্মকাণ্ডের উপস্থাপনা ইতিবাচক হয়। যেমন, সরকারি বৈঠক, আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ইত্যাদি।

সরকারি দলের সদস্যরা অনেক সময় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে নির্বাচনী প্রচারকাজকে গোপন করার চেষ্টা করেন অথবা নির্বাচনী প্রচারকাজ হলেও সেগুলোকে সরকারি কাজের অংশ হিসেবে দেখাতে চান। যেমন, কোনো ভবন বা সেতু উদ্বোধন, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেয়া, মাদকবিরোধী কোনো কর্মসূচির উদ্বোধন ইত্যাদি। এজন্য সাংবাদিকদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়, যাতে এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে সরকারি দলের সদস্যরা কোনো আলাদা সুবিধা না পান। এটি খেয়াল রাখা জরুরি, যাতে ক্ষমতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র প্রার্থীদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা খর্ব করতে না পারে।

নির্বাচনকালীন সরকারের দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করছে কি না, সে সম্পর্কে ভালো একটি রিপোর্টের উদাহরণ হলো নিচের রিপোর্টটি। রিপোর্টটি ২০১৩ সালের ২ ডিসেম্বর ছাপা হয়।

মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের গাড়িবিলাস

৭৭ গাড়ি এলজিইডির হাতছাড়া, চালক, জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচও দিতে হয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের গাড়িবিলাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গাড়ি ব্যবহারকারীদের তালিকায় সরকারের কর্মকর্তারাও

অধ্যায় ৮

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচনকালীন রিপোর্টিং

- নির্বাচনী প্রচার কাভারেজ
- নির্বাচনী প্রচার কাভারেজে গণমাধ্যমের মুনশিয়ানা
- জনসভা ও বক্তৃতা রিপোর্টিং
- বিদ্বেষপূর্ণ/ঘৃণাত্মক বক্তব্য
- ভোটারকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা
- নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংবাদিকের নিরাপত্তা
- ভোট গ্রহণ ও ফলাফল কাভারেজ

নির্বাচনকালীন রিপোর্টিং

নির্বাচনকালীন রিপোর্টিং বলতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। এটি নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ পর্যায়ে প্রত্যেকটি দিন গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংকে প্রধানত দুটি ধাপে ভাগ করা যায়।

১. নির্বাচনী প্রচার কাভারেজ;

২. ভোট গ্রহণ ও ফলাফল কাভারেজ।

নির্বাচনী প্রচার কাভারেজ

নির্বাচনী প্রচার কাভারেজ বলতে এখানে তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোটের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে যেসব বিষয় বা ক্ষেত্র নিয়ে রিপোর্ট করা যায় সেগুলো হলো :

১. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট প্রশাসন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বে চলে যায়। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২-এর ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের প্রত্যেকটি শূন্য আসনে নির্বাচনের জন্য অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে তফসিল ঘোষণা করবে। সে তফসিলে থাকবে –

- কোন দিন বা কোন দিনের মধ্যে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবেন
- মনোনয়ন বাছাইয়ের সবশেষ দিন-তারিখ
- মনোনয়ন প্রত্যাহারের সবশেষ দিন-তারিখ এবং
- মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন থেকে অন্তত ১৫ দিন পর ভোট গ্রহণ।

তফসিল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার বা তাঁর পক্ষে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিজ নিজ কার্যালয়ে মনোনয়ন জমাদান ও প্রত্যাহারের বিষয়ে নোটিশ দিয়ে থাকেন।

নির্বাচনী তফসিল প্রকাশের জন্য সাংবাদিকের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হয়। তফসিলে বরাদ্দকৃত সময় যথাযথ এবং উপযুক্ত কি না, তফসিল ঘোষণার আগেই মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিশেষ করে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা

হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তা ছাড়া তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সম্ভাব্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কেও সংবাদ পরিবেশন করা যায়।

২. আসন ভাগাভাগি

আমাদের দেশে গত কয়েকটি সংসদ নির্বাচনে জোটভিত্তিক নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে এবং তফসিল ঘোষণার আগে বা পরে খুব দ্রুত প্রধান দলগুলোর সঙ্গে মাঝারি ও ছোট দলগুলোর নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে জোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় কোনো প্রার্থী না দেয়া এবং নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক আসন জয় নিশ্চিত করা। এ ধরনের জোটভিত্তিক নির্বাচনে কোন দল কতটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে, জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনের কারণে কোন কোন হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না, জোটের কারণে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কারা কারা নির্বাচন করছেন ইত্যাদি বিষয়ে ভালো ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরি করা যায়।

৩. মনোনয়ন

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

১. কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তাঁর বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন।

২. কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন, যদি –

(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করেন

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় থেকে অব্যাহতি লাভ না করেন

(গ) তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিক কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকে

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে-কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন অথবা

(ছ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

এসব যোগ্যতার মানদণ্ড বিবেচনায় রেখে প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়ন জমা দেয়া ও প্রত্যাহার নির্বাচনী রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়ন পাবার ধরন কেমন হয়েছে তা মানুষ জানতে চায়। অবশ্য আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো তফসিল ঘোষণার অনেক আগে থেকেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে আসন ভিত্তিতে রিপোর্ট করে থাকে। কিন্তু তফসিল ঘোষণার পর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। প্রত্যেকটি দলের প্রার্থী মনোনয়নের ধরন তুলনামূলক আলোচনা করে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট করা যায়। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থী মনোনয়নের প্রবণতা ও ধারা বিশ্লেষণ করে ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে আদর্শের চেয়ে অর্থ কিংবা পেশিশক্তি অথবা অন্য কোনো কারণ প্রভাব রেখেছে কি না, তাও তুলে ধরা যায়। দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী, আদিবাসীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব কেমন তা নিয়েও রিপোর্ট করা যায়।

পাঠক বা দর্শক মনোনীত প্রার্থীদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী থাকে, কেননা এসব প্রার্থী বা ব্যক্তি সমাজের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক (Dhar, 2006, p. 100)। প্রার্থীদের মতাদর্শ, রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন, দল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোতে সাফল্য-ব্যর্থতা, মামলা-মোকাদ্দমা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে প্রচুর ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এ সময় করা সম্ভব।

৪. হলফনামা

২০০৫ সালে এক রায়ে হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আট ধরনের তথ্য হলফনামা আকারে সংগ্রহ এবং তা জনগণের জন্য প্রকাশের নির্দেশ দেন। এসব তথ্য হলো – প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত কি না, অতীতে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল কি না এবং হলে এর ফলাফল কী, প্রার্থীর পেশা, প্রার্থী ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ, ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলো কি না, হলে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করেছেন এবং ঋণসংক্রান্ত তথ্য। ২০০৮ সাল থেকে অর্থাৎ নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীরা এ ধরনের হলফনামা জমা দেয়। প্রার্থীদের সম্পত্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতায় অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি বিষয়ে আগের হলফনামাগুলোর সঙ্গে সাম্প্রতিক হলনামার তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সাংবাদিকরা রিপোর্ট করতে পারেন।

৫. নির্বাচনী ইশতেহার

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান প্রধান দলগুলো তাদের পরিকল্পনা, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণের সামনে নির্বাচনী ইশতেহার তুলে ধরে। নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধানত তিনটি জিনিস থাকে – ক) দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে নিজ নিজ দলের মূল্যায়ন; খ) নিজেদের শক্তির দিক এবং অপরের দুর্বলতার দিক বর্ণনা; এবং গ) প্রতিশ্রুতিসমূহ (Akash, 2006, p. 129)।

রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা হলো এই নির্বাচনী ইশতেহার। আবার ভোটের ময়দানে কোন দলকে গ্রহণ করবেন আর কোন দলকে বর্জন করবেন, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এই ইশতেহার অনেক বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ইশতেহার নিয়ে দলভিত্তিক, দলগুলোর মধ্যকার তুলনামূলক এবং বিগত নির্বাচনগুলোতে দেয়া ইশতেহারের কতটুকু পূরণ করেছে বা করেনি তার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট করতে পারেন সাংবাদিকরা। এতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধ্যবাধকতা অনুভব করবে, শুধু ঐতিহ্য রক্ষার জন্যই ইশতেহার দেবে না। আবার প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা পূরণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত সে বিষয়ে দলীয় নেতা ও প্রার্থীদের প্রশ্ন করে পাঠকের অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়।

৬. নির্বাচনী প্রচারাভিযান

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা দেশের প্রান্তে দলীয় ও ব্যক্তিগত প্রচার চালায়। ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করা যায় না। কীভাবে নির্বাচনী প্রচার কাজ চালাতে হবে সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। কিন্তু কোনো আইনে একজন সাংবাদিক কীসের প্রতি নজর দেবেন সে সম্পর্কে লেখা থাকে না। নির্বাচনী প্রচারের সময় গণমাধ্যম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিপোর্ট করে থাকে :

ক. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী

গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের শক্তি নিয়ে রিপোর্ট করতে হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেকটি দল সম্পর্কে গণমাধ্যমকে ভোটারদের তথ্য দিতে হয়। এমনকি নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থী সম্পর্কেও তথ্য দিতে হয়।

খ. ইস্যু

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মত আছে। প্রত্যেক দলের কাছে তার নিজস্ব মতই শ্রেষ্ঠ এবং এই মতের ভিত্তিতে তারা ভোটারদের কাছে টানতে চায়। একই ইস্যুতে বিভিন্ন দলের মধ্যকার পার্থক্যগুলো তুলে ধরে দলগুলোর অবস্থান ভোটারদের কাছে তুলে ধরা গণমাধ্যমের কাজ। জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভাবলেও কিছু রাজনীতিবিদ কথা বলতে চান না, এমন ইস্যুগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো নিয়ে গণমাধ্যমকে তথ্য তুলে ধরতে হয়। আবার কিছু রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য বেশ বিতর্কের জন্ম দেয়। গণমাধ্যমের কাজ হলো এসব ইস্যু ও বক্তব্য নিয়ে নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট করা। একজন রিপোর্টার বা সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে আপনি রাজনৈতিক প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন না। 'তিনি বলেন', 'তিনি আরও বলেন' – এ ধরনের সাংবাদিকতা পরিহার করুন। আবার প্রার্থীর বক্তব্যের বিচারক বা আয়োজকও আপনি নন। তবে প্রত্যেকটি ইস্যু আপনাকে স্বাধীনভাবে কাভার করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা দলের বিরোধিতা কিংবা ইতিমধ্যে বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বলেই কোনো বিষয় কাভার করবেন না।

গ. নির্বাচন-প্রক্রিয়া

জনগণের অংশগ্রহণে সহায়তা করতে নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যম নির্বাচন-প্রক্রিয়া নিয়ে প্রচুর তথ্য দিয়ে থাকে। কীভাবে ভোটার নিবন্ধন করতে হবে, প্রচারের সময়কাল, ভোট গণনাকারী, দলগুলো কত টাকা খরচ করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট আরও অনেক বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম তথ্য তুলে ধরে। কোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তির পক্ষে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া কিংবা ভোটারদের অধিকার খর্ব করাসহ যে-কোনো ধরনের নিয়মনীতির লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না, তার দিকে গণমাধ্যমকে কড়া নজর রাখতে হয়।

নির্বাচনী প্রচার কাভারেজে গণমাধ্যমের মুনশিয়ানা

দল এবং প্রার্থীরা জানে যে, গণমাধ্যমে যা দেখে ও শোনে তা-ই ভোটাররা বিশ্বাস করে। তাই রাজনীতিবিদ ও তার দলের কর্মীরা তাদের পক্ষে সংবাদ করার জন্য সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতে যারপরনাই চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হলো তাদের বহুল ব্যবহৃত হাতিয়ার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি লিখিত আকারে সংবাদ সম্মেলনে দেয়া হয় কিংবা সরাসরি গণমাধ্যমের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মনে রাখতে হবে, ভালো নির্বাচন রিপোর্টিং কখনই শুধু দলীয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। গণমাধ্যমের কাজ শুধু দলীয় নেতার বক্তব্য প্রচার করা নয়; বরং কোথায় এ বক্তব্য দেয়া হয়েছে, ওই সময় কতজন লোক ছিল এবং তাদের মত কী এবং এ সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো কী বলে – তা নিয়ে গণমাধ্যমকে সংবাদ করতে হয়। ভোটাররা এ ধরনের তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখেন, যাতে তাঁরা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যে-কোনো তথ্য সাংবাদিককে মাঠ পর্যায়ে নিজে গিয়ে সাংবাদিকতার হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই প্রকাশ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, নির্বাচনী প্রচার মৌসুম কোনো উন্মুক্ত মৌসুম নয় – *Campaign season is not open season.* (Grant & Gibbings, 2009, p. 18)। এ সময় যা খুশি তা প্রচার বা প্রকাশ করা যায় না।

মূলত নির্বাচনী প্রচার – বক্তব্য, দলীয় র‍্যালি, সভা-সমাবেশ ও দলীয় সংবাদ সম্মেলন – এগুলো ঘিরেই আবর্তিত হয়। দেখা যায়, প্রায়ই একই কথা ঘুরেফিরে উচ্চারিত হয় নেতাদের মুখে মুখে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের একই কথার পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। নেতাদের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা পেশাদার সাংবাদিকের কাজ নয়। বরং কোথায় বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, বিরোধী পক্ষের প্রতিক্রিয়া এবং কীভাবে এই বক্তব্য নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভুল তথ্যসহ বিশ্লেষণ তুলে ধরতে হয়। Ross Howard (2004, p. 17) বলেছেন, *As professional journalists, we are not just repeaters or stenographers. We are reporters. We include other important information in our news stories.* নির্বাচন প্রচার কাভারেজের সময় একজন বিচক্ষণ সাংবাদিককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয় :

ক) জনসভা ও বক্তৃতা রিপোর্টিং

নির্বাচনী প্রতিবেদনের বড় একটি উৎস জনসভা। রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো দেয়া হয় দলীয় সমর্থকদের মনোবল জোরালো করতে এবং সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে নতুন সমর্থকদের সমর্থন পেতে। অন্য দলগুলোর দুর্বল বা দুর্নীতি কিংবা ভোটারদের কাছে প্রতিপক্ষের কম আকর্ষণীয় বিষয়গুলো এসব বক্তব্যে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এসব রাজনৈতিক বক্তৃতায় প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদকে আক্রমণ করার জন্য সহিংস ভাষা ও উত্তেজনাকর আবেগের ব্যবহার করা হয়। এসব মন্তব্য সেন্সর করা যাবে না, সঠিক ও নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে হবে। তবে উত্তেজনাকর মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়নের জন্য যত দ্রুত সম্ভব অপর পক্ষের বক্তব্য নিতে হবে এবং তা প্রকাশ/প্রচার করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের মন্তব্যও এসব বিষয়ে প্রকাশ/প্রচার করতে হবে।

পেশাদার সাংবাদিকরা বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদে কখনই নিজের ব্যক্তিগত মত বা সমালোচনা দেয় না। পেশাদার সাংবাদিকরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তব্য দেয়ার সময় প্রশংসা করেন না বা তালি দেন না, কারণ তারা নিরপেক্ষ এবং নিরপেক্ষতাই তাদের মূল অস্ত্র।

- **জনসমাগমের আকার**

  নির্বাচনী প্রচারের খবর বিশেষ করে জনসভার খবর প্রকাশ/প্রচারের সময় একটি বিষয় লক্ষ করা যায়। সেটি হলো সাংবাদিকরা এক ধরনের অনুমাননির্ভর তথ্যের ওপর ভর করে জনসমাগমের আকার তুলে ধরেন। যেমন : 'বিশাল জনসমাগম', 'লাখ লাখ মানুষ/কর্মী/সমর্থকের সমাবেশ' ইত্যাদি। এ ধরনের অনুমাননির্ভর তথ্যের মাধ্যমে জনসমাগমের হিসাব তুলে ধরা সমীচীন নয়। তবে উপস্থিতির হার সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য থাকলে তা তুলে ধরা যায়। যেমন ধরুন, কোন সভাকক্ষে কত আসন আছে তা আপনি যদি জানেন, তাহলে সে সংখ্যা তুলে ধরতে পারেন।

  তবে কোনো ধরনের সংখ্যা তুলে না ধরা ভালো। পাশাপাশি 'ব্যাপক' (large), 'বৃহৎ' (huge), 'বিশাল' (massive), 'বিপুল' (gigantic) এবং 'ছোট' (small), 'হতাশাজনক' (disappointing), 'আংশিক' (paltry) কিংবা এমন মন্তব্যধর্মী কোনো শব্দ ব্যবহার না করাই উচিত। জনসমাগমের আকার পরোক্ষভাবে তুলে ধরা যেতে পারে: 'পল্টন ময়দানের দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়' কিংবা 'শহরের মূল সড়কগুলো দলীয় নেতা-কর্মীদের গাড়িতে ভরে গেছে'।

- **পরিচিতি**

  যখন আপনি কোনো সংবাদে কোনো তথ্য দিচ্ছেন তখন অবশ্যই আপনাকে সূত্রের পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' দলের প্রার্থী জনাব করিম বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে গ্যাসের দাম কমাবেন। এক্ষেত্রে সংবাদে কে বলেছেন অর্থাৎ জনাব করিমের পরিচিতিসহ তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ এতে পাঠক/দর্শক তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তথ্যটি যে রিপোর্টের মনগড়া নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবে।

- **পক্ষাবলম্বন না করা**

সাংবাদিকও একজন মানুষ, সামাজিক জীব। তাঁর নিজেরও রাজনৈতিক দর্শন এবং পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু সে দর্শনের কোনো প্রতিফলন তাঁর প্রতিবেদনে থাকতে পারে না। এমন কোনো প্রতিফলন থাকতে পারবে না, যাতে তিনি কোনো পক্ষ নিচ্ছেন– এটা প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেদনকে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রতিবেদনে কোনো দলের প্রতীক বা রং প্রতিফলিত হবে না। কোনো রাজনৈতিক দল থেকে যে-কোনো ধরনের উপহার, উৎকোচ বা সুবিধাদি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিক কোনো দলের উকিল নয়ন। এ প্রসঙ্গে Grant এবং Gibbings (2009, p. 19) বলছেন, '*Do not wear apparel bearing party emblems or colours. Politely decline offers of party paraphernalia, giveaways and benefits. Whether on duty or off, reporters should never heckle speakers.*'

চিত্রসাংবাদিক সমাবেশস্থলের জনসাধারণের বৈচিত্র্যময় ছবি তখনই তুলবেন, যদি সেখানে উপস্থিত জনতার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে।

- **গণমাধ্যমের অতিরঞ্জন পরিহার**

রাজনৈতিক দলগুলো জানে যে অনেক লোক গণমাধ্যমে যা দেখে ও শোনে তা-ই বিশ্বাস করে। সে কারণে প্রত্যেক দলই তাদের নেতা বা প্রার্থীদের ভোটারদের কাছে আবেদনময়ী করে তুলতে কিছু 'লঘু সংবাদ' (soft new) জন্ম দেয়ার চেষ্টা করে। যেমন, স্কুল বা বাড়িতে যাওয়া, শিশুদের চুমু খাওয়া বা উৎসুক জনতার সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি। পেশাদার সাংবাদিকরা এসব লঘু সংবাদ এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বিষয়ে প্রতিবেদন/রিপোর্ট করবে। কিন্তু সাধারণ ভোটাররা যেসব বিষয়ে কথা বলছে বা অন্য দলের প্রার্থী/নেতারা যেসব বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন সেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দলের নেতাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সাংবাদিকরা কঠিন প্রশ্ন করার জন্য এসব লঘু সংবাদকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া অন্য দলের নেতারা যেসব বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দলের নেতার মত না জানলে রিপোর্টে ভারসাম্য আনা কঠিন হয়ে যায়। তবে প্রশ্নগুলো অবশ্যই ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হবে, যত কঠিন প্রশ্নই হোক না কেন, তা ভোটার ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নির্বাচন হচ্ছে ভোটারদের জন্য, রাজনীতিবিদদের জন্য নয়। আবার গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনসমর্থন নিজের দিকে আনার চেষ্টা সব দল ও প্রার্থীর থাকে। সে কারণে রাজনীতিবিদদের কিছু কিছু শব্দ গণমাধ্যমে বক্তব্য দেয়ার সময় ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, 'নতুন', 'প্রগতিশীল', 'সজীব', 'ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা', 'ভিশনারি', 'বৈচিত্র্যময়', 'উন্নত' ইত্যাদি। এসব ইতিবাচক শব্দের মাধ্যমে রাজনীতিবিদ তার দল বা প্রার্থী সম্পর্কে জনমনে একটি ভালো ধারণা গড়ে তুলতে চান। রিপোর্টাররা এসব শব্দ শুধু সরাসরি মন্তব্য/প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া অন্য কোথাও এসব শব্দের বারবার ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

সব মানুষের নেতা মেনন

ঢাকা-৮ আসনে মহাজোট প্রার্থীর কোনও কালো টাকা নেই তবে এলাকার প্রতিটি ঘরে তিনি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নেতা হিসেবে পরিচিত। আর এই ভরসা নিয়েই তিনি ভোটারের ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ছাড়াও তাঁর কর্মী সমর্থকেরা বিশ্বাস করেন দিনবদলের এই সময়ে সব প্রার্থীর এবং ভোটারের পূর্ণ সহানুভূতি তিনি অর্জন করতে পেরেছেন।

তোপখানা রোড এর রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক আলি মিয়াঁ বলেন, তাকে ভোট দিলে অন্তত সন্ত্রাসী জন্ম নেবে না। উপকার না হোক, জনগণ অপকার চায় না। তবে তিনি সাংসদ হলে বেকার সমস্যা দূর করার জন্যে সংসদে লড়াই চালাতে পারবেন।

তাঁর মুল প্রতিদ্বন্দ্বী চার দলীয় জোটের প্রার্থী হাবিব-উন-নবী সোহেল নিজে স্বীকার করেছেন – মেনন একজন ত্যাগী ও সাধারণ মানুষের নেতা। ঢাকা-৮ আসনের অনেক ভোটার এবার সাধারণ মানুষের নেতা বলেই মেননের প্রচারণা চালাচ্ছেন।

মগবাজারের আদি বাসিন্দা বাদল কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিগত দিনে বড় বড় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পর দেখা গেছে, উন্নয়নের পরিবর্তে সন্ত্রাসীর জন্ম হয়েছে। উপকারের বদলে এলাকাবাসীকে চাঁদা দিতে দিতে ফতুর হতে হয়েছে।

নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৫৩, ৫৬, ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ ভোটারদের মধ্যে মেননের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। গুলবাগের এক বস্তিতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে নৌকার পোস্টার ছাড়া আর কোন পোস্টার নেই। বস্তির বাসিন্দা খোদেজা খাতুনের সরাসরি অভিমত পাওয়া গেল, 'মেনন হইলো আমাগো গরিব মাইনসের নেতা। তাকে ভোট দিলে হেই আমাগো দুঃখ বুঝব।'

এ আসনে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ রয়েছে যারা নিরপেক্ষ ভোটার হিসেবে পরিচিত। রাজনীতি বিমুখ হয়ে তাদের অনেকেই ভোটারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের পরিকল্পনা ছিল 'না' ভোটে সিল মারা। কিন্তু শিক্ষিত জাতীয় নেতা পাওয়ায় তাঁরা এবার

ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং মেননের প্রতীকে সিল দেবে।

মতিঝিলের একজন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তাদের সাংসদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের চাঁদা দিতে হয়। চাঁদার এই যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবেন এ আশা নিয়ে তিনি মেননের পক্ষে প্রচারণা করছেন।

সাধারণ মানুষ এমনকি প্রতিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই মনে করেন, তিনি একজন বর্ষীয়ান, দুর্নীতিমুক্ত ও মেধাবী প্রার্থী। নগরের যে কয়জন উপযুক্ত প্রার্থী রয়েছে, এর মধ্যে মেননের নাম আসে সবার আগে। প্রতিদ্বন্দ্বী বাসদের মোঃ রাজেকজ্জামান ও কল্যাণ

পার্টির সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মনে করেন, মেননের মত মানুষ নির্বাচিত হয়ে সংসদে যেতে পারলে সব মানুষের উপকার হবে।

ফকিরাপুল-আরামবাগ এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সেখানকার ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কর্মচারীরা মেননের পক্ষে।

এই রিপোর্টটি একপেশে এবং পক্ষপাতমূলক। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার মতো কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য এই রিপোর্টটিতে নেই। যেমন– অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর যদি কোনো মন্দ বা খারাপ দিক থাকে সেগুলো যথাযথ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তুলে ধরে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেত।

আরেকটি লক্ষণীয় হলো, তথ্যের অভাব থাকলে এবং নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলে রিপোর্টে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়। রিপোর্টে উল্লিখিত প্রার্থী– 'বর্ষীয়ান, দুর্নীতিমুক্ত ও মেধাবী প্রার্থী' – এ কথা কয়েকবার বলা হয়েছে। অথচ কোনো উপযুক্ত প্রমাণ কিংবা বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্য এর সপক্ষে রিপোর্টে নেই।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, ভোটাররা যাতে সব দল বা মত সম্পর্কে তথ্য জেনে ভোটদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেজন্য ভারসাম্য বা নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ঘটনা বা ইস্যু সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মত বা ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন। অন্যথায় সেটি একপেশে রিপোর্ট হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন রিপোর্টার কোন ভোটার কাকে ভোট দেবেন সে প্রশ্ন করতে পারেন না। এ রিপোর্টে ভোটার কার পক্ষে ভোট দেবেন তা সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে।

'উন্নয়ন এবং এম কে আনোয়ার একসূত্রে গাঁথা'

৭৭ বছর বয়সী এম কে আনোয়ার শীত দূরে ঠেলে চলে যাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকায়। হোমনার লোকজন তাঁকে 'স্যার' সম্বোধন করে ডাকে। 'স্যার' আসছেন এমন খবর গ্রামে এলে নারী-পুরুষ সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ১৯ ডিসেম্বর তিতাস উপজেলার বিরামকান্দিতে এ দৃশ্য চোখে পড়েছে।

হোমনার দুলালপুর গ্রামের ফরিদ উদ্দিন বলেন, '১৯৯১ সালে হোমনা এলাকায় এক ইঞ্চি জায়গাও পাকা ছিল না। নদী আর ফেরি দিয়েই এখানকার মানুষ এক স্থান থেকে

অন্য স্থানে যাতায়াত করত। তিনি এমপি এবং পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী হওয়ার পর রাতারাতি বদলে গেল এখানকার মানুষের জীবনধারা।'

হোমনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'স্যার এর নজরদারিতে হোমনায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও টেন্ডারবাজি হয়নি। কোনও বাহিনী গড়ে উঠেনি। প্রত্যেকটা কাজ তিনি নিজ উদ্যোগে মনিটরিং করতেন। এবারও তিনি বিশাল ব্যবধানে জয়ী হবেন।'

কুমিল্লা-২ (হোমনা ও তিতাস) আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী এম কে আনোয়ার বলেন, '৩৪ বছরের সরকারি চাকরি আর ১৮ বছরের রাজনীতি আমাকে জনসেবার পথে ধাবিত করেছে। এবারের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় হলফনামায় পেশার বিবরণীতে জনসেবাকেই উল্লেখ করেছি।'

তিনি বলেন, '৩৪ বছরের কর্মজীবনে আমি ঢাকা জেলার প্রশাসক, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, বহিঃসম্পদ এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব ছিলাম। ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে চাকরি থেকে অবসর নিই। ওই বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। চারবার সাংসদ হয়ে সরকারের নৌ, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছি। কৃষি এলাকার মানুষের জীবনধারা বদলে দিয়েছি। সংখ্যালঘুরা এখানেও শান্তিতে বসবাস করছে'।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ সম্পর্কে বলেন, 'বিরোধী মতের প্রতি কখনই আমার কোনও বক্তব্য নেই। তাই মহাজোটের প্রার্থী সম্পর্কে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। তবে আমি যেখানে যাই সেখানেই ভোটারদের বলি, আমার চেয়ে যোগ্য কোন প্রার্থী থাকলে তাকে ভোট দিন, প্রয়োজনে আমিও তাকে ভোট দিব। ৪ নম্বর কড়িকান্দি ইউনিয়নের সভাপতি আলি হোসেন মোল্লা বলেন, 'তিনি সারা দেশে হোমনাকে পরিচিত করেছেন।' তিতাস উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাদেক হোসেন সরকার বলেন, 'নির্ঝঞ্ঝাট একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি।'

কুমিল্লার একটি মানবাধিকার সংগঠনের একজন আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, উন্নয়ন এবং এম কে আনোয়ার এক সূত্রে গাঁথা। তাঁকে হোমনার উন্নয়নের কাণ্ডারি বলা চলে।

এবার এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছেন হোমনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, পুস্তক ব্যবসায়ী এবং মুরাদ নগরের রামচন্দ্রপুর অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এমএসসি পাস মজিদ এ আসনে তাঁর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ বলেন, 'এম কে আনোয়ার একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আশা করি, এবার এখনকার ফলাফল ভিন্ন রকম হবে। তিনি নির্বাচিত হলে শিক্ষাকে সর্বোপরি গুরুত্ব দেবেন। এলাকার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন বলে জানিয়েছেন।'

এই রিপোর্টটি পড়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বক্তব্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এক ধরনের ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একজন প্রার্থীর বিশেষ ইতিবাচক দিক তুলে ধরার জন্য তা করা হয়েছে। ওই প্রার্থী আসছেন এমন খবরে গ্রামের নারী-পুরুষ সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে – এটি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন। গণমাধ্যমের কাজ কোনো প্রার্থীর পক্ষে সাফাই গাওয়া নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর ভালো ও খারাপ দিক তুলে ধরা ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের সপক্ষে গণমাধ্যম ও রিপোর্টারদের ব্যবহার করার জন্য বেশ কিছু লোক থাকেন। এঁদেরকে 'স্পিন ডক্টর' বলে থাকে। এঁদের দেয়া তথ্যে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। অবশ্যই অন্য পক্ষের ভাষ্যসহ রিপোর্ট করতে হবে। শুধু স্পিন ডক্টর বা রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভর না করে ভোটারদের বক্তব্য ও বিশেষজ্ঞের মতামত নিলে পক্ষপাতহীন রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব।

নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের সময় সাংবাদিকদের একটি দায়িত্ব হলো জনপ্রতিনিধিগণ কীভাবে জনসেবা নিশ্চিত করবেন তা স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরা। যদি কোনো প্রার্থী কোনো নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেন, তাহলে তাঁকে জিগ্যেস করতে হবে বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় আর কীভাবে তিনি এ নতুন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করবেন।

জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপস্থাপন করা সাংবাদিকদের দায়িত্ব। তাঁরা যেসব প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর বাস্তবায়ন – প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করে পাঠককে জানানোও রিপোর্টারদের দায়িত্ব। কোনো প্রার্থী মিছামিছি জনগণকে আশ্বাস দিচ্ছেন কি না সেটি নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করা রিপোর্টারের কাজ। এক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমন কোনো প্রার্থী যদি তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ ও বিস্তারিত না জানান, তাহলে রিপোর্টার প্রশ্ন করতে পারেন – 'আপনি যদি কাজটি কীভাবে করবেন তা না জানেন, তাহলে কীভাবে আপনার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করবেন?', 'যদি এ সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত পরিকল্পনা না থাকে তাহলে জনগণ আপনাকে কেন ভোট দেবে?' আবার অনেক সময় জনগণের দোহাই দিয়ে অনেক প্রার্থী বক্তব্য দিয়ে ভোটারদের মন জয় করতে চান। সেক্ষেত্রে এমন তথ্যের ভিত্তি কী তা অবশ্যই রিপোর্টারের জানতে চাওয়া উচিত। যেমন, যদি কোনো প্রার্থী বলেন জনগণ এই আইনের পরিবর্তন চায়, সেক্ষেত্রে রিপোর্টারের জিগ্যেস করা উচিত – 'আপনি জনগণের এ মত কীভাবে জানলেন?' অথবা 'কোন জরিপ বা তথ্যের ভিত্তিতে আপনি এমন মন্তব্য করেছেন?'

সব সময় জিগ্যেস করুন

আজকের সংবাদে কী দিতে পারেননি? সকল পক্ষকে কি অন্তর্ভুক্ত করা গেছে? রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অবহেলিত বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করুন। সাধারণত গণমাধ্যমে জায়গা পায়

না, এমন সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে রিপোর্ট করুন। শুধু তারকা রাজনীতিবিদদের নিয়ে সংবাদ করবেন না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্যই বেশি কাভারেজ পাবে, কিন্তু ছোট দলগুলোকে তাদের কথা প্রচারের জায়গা দিতে হবে। তারা যদি সংবাদমূল্যের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে, তাহলে অবশ্যই তা তুলে ধরতে হবে। ছোট দলগুলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলেও প্রায়ই দেখা যায়, হয় সেগুলো অবহেলিত থাকে অথবা বড় দলগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তুর মাঝে হারিয়ে যায়।

যখন আপনি কোনো নির্বাচন প্রচার নিয়ে রিপোর্ট করবেন তখন আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয় সংবাদের মূল্য বিচারের জন্য বিবেচনা করতে হবে। যদি কোনো নির্বাচনী রিপোর্টে কমপক্ষে নিম্নলিখিত দুটি উপাদান না থাকে, তাহলে সেটি সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

- **গুরুত্ব :** বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোই আপনার বিবেচ্য। সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের প্রচারে গুরুত্ব পাওয়া বিষয়গুলোর প্রতি ছোটাই আপনার কাজ নয়। বরং সাধারণ মানুষের নিত্যদিনকার সমস্যাগুলো নিয়ে রিপোর্ট করুন। কোনো ঘটনার গুরুত্ব বলে দেবে ওই ঘটনাটি কতটা তাৎপর্য দিয়ে প্রকাশ বা প্রচার করা হবে। এ প্রসঙ্গে এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন, *The more a news event affects the structure of power in society, the more importance it may gain and therefore, the more coverage it receives.* (Ellis 1999)।

- **প্রাসঙ্গিকতা :** মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে নির্বাচনী রিপোর্ট তৈরি করুন। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আবাসন সমস্যা ইত্যাদি। এগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দিন।

- **বিতর্কিত বিষয়ে অতিরঞ্জন :** স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর প্রতি পাঠকের আগ্রহ থাকে বেশি। কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ তৈরি করতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভুল সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না। একটি বিতর্কিত গুজব সাংবাদিকদের চোখে ধুলো দেয়। এতে তারা ভোটারদের প্রকৃত চাওয়া থেকে দূরে থাকে। মনে রাখতে হবে, যে-কেউ যা-কিছু বললে তা সংবাদমূল্যের বিচারে খবর হতে পারে না। কে বলছে এবং কোন প্রেক্ষাপটে কী বলছে তার গুরুত্ব পরীক্ষা করুন।

- **একাত্মতা :** সাধারণ ভোটাররা কীভাবে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং এসব সমস্যা কীভাবে তাদের নিত্যদিনের জীবনযাপনকে প্রভাবিত করছে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভাষ্য আপনার সংবাদে তুলে ধরুন। এভাবে সাধারণ মানুষকে সংবাদে একাত্ম করলে তারা নির্বাচনী সংবাদের বিষয় ও প্রেক্ষাপট সহজেই বুঝতে পারবে।

- **গঠনমূলক :** নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমন গঠনমূলক সংবাদ করা যায়, যাতে জাতীয় ঐক্য ত্বরান্বিত হয়। দেশের বেশিরভাগ মানুষের সমস্যাগুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

ভয়হীন রিপোর্ট করা

কঠিন ইস্যুর মৌলিক বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করতে ভয় পাবেন না। 'এ নিয়ে আমরা রিপোর্ট করেছি' কিংবা 'এ নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ নেই' এমন দায়িত্ব এড়ানোর মনোভাব সংবাদকক্ষে কখনই পরিদর্শন করা যাবে না।

'প্যাক' সাংবাদিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকা

এ ধরনের সাংবাদিকতায় রিপোর্টার একই ঘটনার ওপর মনোনিবেশ করে এবং একইভাবে ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়। বিশেষত এটা ঘটে থাকে যখন একজন প্রার্থী জরিপে এগিয়ে থাকে কিংবা যখন কোনো বিতর্ক উত্থাপিত হয়।

রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ তুলে ধরা

প্রচার-কৌশল, রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ও ছলচাতুরীগুলো তুলে ধরুন। প্রচারের সময় প্রদত্ত ওয়াদাগুলো গভীরভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন। বিজ্ঞাপনের কৌশলগুলোর ব্যবচ্ছেদ করুন। দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতিগুলো যাচাই করুন। যথাযথ মূল্যায়ন, বিকৃতি ও জালিয়াতিগুলো তুলে ধরুন।

প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ও অসংগতি তুল ধরুন

শুধু কোনো একদিনে নয়, বরং বছরের পর বছর বা বিভিন্ন সময়ে প্রার্থীরা কী বলেছেন তা মনে রাখুন। সেগুলো নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে যেসব অসংগতি ধরা পড়ে সেগুলো নিয়ে রিপোর্ট করুন।

খ) বিদ্বেষপূর্ণ/ঘৃণাত্মক বক্তব্য (Hate speech)

নির্বাচনে ভাষা ও ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর মাধ্যমে যেমন ভোটারদের মন জয় করা যায়, তেমনি হিংসা ও বিদ্বেষের আগুনও ছড়িয়ে দেয়া যায়। বিদ্বেষপূর্ণ বা ঘৃণাত্মক ভাষা দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরির খুবই প্রচলিত একটি কারণ। একটিমাত্র শব্দ বা ছবি সারা দেশে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য ভাষা ও ছবির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। কোনো কিছু লেখা বা বলার আগে সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটি ব্যবহার করুন – '*Listen to sources and political candidates openly and without prejudice.*' অর্থাৎ কোনো পক্ষপাত ছাড়াই মুক্ত মন নিয়ে সূত্র ও রাজনীতিবিদদের কথা শুনুন। ব্যাপক অর্থে তাদের কথার মমার্থ বুঝতে হবে।

ভাষা ও শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী হলো – 'OUR WORDS CAN KILL – BE CAREFUL'। এজন্য একজন সাংবাদিককে ভাষা ব্যবহার ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে খুবই স্পর্শকাতর ও যত্নবান হতে হয়, যাতে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ছবি অনেক সময় শব্দের চেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে।

উত্তেজক ভাষার মধ্যে একটি হলো বিদ্বেষপূর্ণ বা ঘৃণাত্মক বক্তৃতা। ঘৃণাত্মক বক্তৃতা হলো পুরাতন ভাববাণী ও রূপকসহ এমন কিছু শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার, যার মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীকে তার জাত, ধর্ম বা শ্রেণির কারণে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং দল/গোষ্ঠী হিসেবে তাদের বিনাশ কামনা

করা হয়। এ ধরনের বক্তব্যে সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণের জন্য করা হয়। এখানে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ধরনের বক্তৃতা কখনই বিনা চ্যালেঞ্জে প্রকাশ করা উচিত নয়। এ ধরনের বক্তৃতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ। এ ধরনের ঘৃণাত্মক বক্তব্য সম্পর্কে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকারকর্মী এবং যারা এ আক্রমণের শিকার তাদের মতামত সংগ্রহ করে তা রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

বিদ্বেষপূর্ণ বা ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি যার বা যাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা হয়েছে তার বা তাদের বক্তব্যও তুলে ধরতে হবে। এ ছাড়া এ সম্পর্কে সাধারণ ভোটারের প্রতিক্রিয়াও সততার সঙ্গে তুলে ধরা যায়। অনেক সময় এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরলে তা বক্তার জন্য ক্ষতির কারণও হয়। কারণ ভোটাররা তার এ বক্তব্য ভালোভাবে নাও নিতে পারেন।

টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া রিপোর্টার যে তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন, সেটিও বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমাদের নির্বাচন কমিশন প্রণীত নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারের সময় ব্যক্তিগত চরিত্র হরণ করে বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উসকানিমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

ঢাকা-৫ আসনে হাবিবুর রহমান মোল্লা মহাজোটের প্রার্থী

এরশাদ গাইবান্ধায় ফজলে রাব্বীকে বিশ্বাসঘাতক বলায় আ'লীগে ক্ষোভ

ঢাকা-৫ আসনে মহাজোটের প্রার্থী আওয়ামী লীগের হাবিবুর রহমান মোল্লা। জাতীয় পার্টি প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা নির্বাচন থেকে সরে যাবেন। আ'লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, কাল পরশুর মধ্যে অপর ৯ আসনের বিষয়েও সমঝোতা হয়ে যাবে।

এদিকে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদ বৃহস্পতিবার গাইবান্ধার ফুলছড়িতে নাপিতেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গাইবান্ধা-৫ আসনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়েই লড়ছেন। তবে তাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলার বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছে না আওয়ামীলীগ।

এ রিপোর্টে বিদ্বেষপূর্ণ ও আপত্তিকর শব্দ 'বিশ্বাসঘাতক' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টটিতে কোথাও প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্য দিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়নি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যাঁর সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর বা তাঁর দলের কোনো বক্তব্যও নেয়া হয়নি।

গ) ভোটারকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা

রাজনীতির ইংরেজি 'politics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'politicos' থেকে, যার অর্থ হলো 'জনগণের জন্য' ('for the people')। তাই যে-কোনো নির্বাচন নাগরিকদের জন্য, তাদের প্রতিনিধি বা রাজনীতিবিদদের জন্য নয়। সে কারণে সাংবাদিকদের জন্য যে-কোনো পেশাদার নির্বাচনী কাভারেজে সর্বাগ্রে জনগণের প্রয়োজনগুলো খুঁজে বের করতে হয় – কোন ইস্যুগুলো নিয়ে জনগণ সবচেয়ে বেশি চিন্তিত তা নিয়েই রিপোর্ট করতে হয়। এ দিকটি বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের নতুন পন্থা হচ্ছে 'ভোটারের কণ্ঠস্বর রিপোর্টিং' বা 'Voters-Voice Reporting'।

নির্বাচনী প্রচার ভোটারদের জন্য, রাজনীতিবিদদের জন্য নয়। শুধু প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের খবর তুলে ধরলেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না। বরং ভোটার, যিনি ভোটের দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে হয়। নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টারের জন্য একটি অন্যতম বিরাট চ্যালেঞ্জ হলো রাজনীতিবিদদের বক্তব্য ও সংবাদ সম্মেলনের উর্ধ্বে উঠে ভোটার ও নাগরিকরা কী চায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট করা। Ammu Joseph (2011) বলেছেন, *One of the greatest challenges the media face while covering elections is how to get beyond the sound and fury of political rallies, speeches and news conferences, in order to report what voters want from their elected representatives and what citizens need from their government.*

নির্বাচনী কাভারেজের পরিকল্পনার সময় ভোটারদের কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন ঘটানোর কথা মনে রাখতে হবে। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য ভোটারের কণ্ঠস্বর রিপোর্টিং খুবই দরকারি। একটি সংবাদ বা নিউজ এজেন্ডায় যদি ভোটারদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন থাকে এবং তাঁদের প্রশ্ন ও ইস্যুগুলো ফুটে ওঠে, তাহলে তা দিয়ে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রভাবিত করা যায়। প্রার্থী ও দলগুলো তাঁদের নিজস্ব দলীয় এজেন্ডা নিয়ে সব সময় কথা বলতে চায়। এ কারণে ভোটারদের কথা তুলে ধরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নিশ্চিত করা যায় – *The idea behind voters' voice reporting is that a news agenda which reflects what voters are talking about and highlights voters' concerns and questions may convince parties and candidates to start talking about those issues, too.* (Joseph, 2011)। এজন্য একজন পেশাদার সাংবাদিককে ভোটারের মতো করে ভাবতে হবে, রাজনীতিবিদদের মতো করে নয়। সাংবাদিকের কাজ হলো দেশের নাগরিক ও ভোটারদের সমস্যা নিয়ে কথা বলা, সেগুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত রিপোর্ট করা। এক্ষেত্রে সাধারণ ভোটারদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের মতও উপস্থাপন করতে হবে। ভোটারের কণ্ঠস্বর রিপোর্টিংয়ের জন্য সাদামাটা রিপোর্টিংয়ের চেয়ে রিপোর্টারকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়, অনেক বেশি মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে হয়। এখানে শুধু প্রার্থীরা যা বলছেন তা লিখলেই চলে না। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে Ross Howard (2004, p. 20) বলছেন, 'It is journalism people will trust, because they know it reflects their concerns. If people trust their media, they will also

speak up for the media and defend it if the government or other interests try to silence good journalism.'

- **ভোটারের আচরণ অনুসরণ ও মেজাজ বুঝতে পারা**

  যে-কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোটারের আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একদিকে পাঠকপ্রিয়তা অন্যদিকে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের জন্য ভোটারদের আচরণ ও মেজাজ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রিপোর্টারের থাকতে হবে। কারণ যে-কোনো নির্বাচনের প্রাণভোমরা হলো ভোটার। আর্থসামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দুর্বলতা, স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিতসমূহ ভোটারদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে (Samad, 2006, p. 13)। ভোটারদের নিরাপত্তা নিয়েও সাংবাদিকদের সচেতন থাকতে হয় :

  - ✓ দলীয় কর্মীদের ভয়ে ভোটাররা আতঙ্কগ্রস্ত কি না
  - ✓ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পর্কে ভোটাররা সন্দিহান কি না
  - ✓ নির্বাচনী প্রচার ও ভোটের দিন সন্ত্রাসের আশঙ্কা আছে কি না
  - ✓ ভোট দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কি না।

- **ভোটারের মতো ভাবুন**

  নির্বাচনী প্রচারের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কাভারেজ নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমকে ভোটারদের মতো করে ভাবতে হবে। ভোটারদের কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন থাকতে হবে। এ ধরনের চিন্তাভাবনা রিপোর্টারকে দলীয় প্রচারের বাইরে গিয়ে খবরের সন্ধান করতে উৎসাহিত করবে। মানুষ রাস্তায় কী নিয়ে কথা বলছে তার প্রতিফলন গণমাধ্যমে থাকতে হবে। সাধারণত মানুষ তাদের নিরাপত্তা, ভালো চাকরি, নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং সন্তানদের জন্য ভালো স্কুল এসব নিয়ে ভাবে। তারা নতুন সেতু, ভালো সড়ক, কম দামে জ্বালানি চায়। কোন রাজনৈতিক নেতা ও দল এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবে মানুষ তা জানতে চায়। গণমাধ্যমকে তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে এসব বিষয়ে জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এসব বিষয় উত্থাপন করে তাদের প্রতিক্রিয়া ভোটারদের জানাতে হয়, যাতে ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে ভোটারদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার রিপোর্টিং হতে হবে নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ। তবে নির্দিষ্ট এলাকা বা আসনের মানুষের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলো জানার জন্য একজন রিপোর্টারকে সময় দিতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে। একজন ভোটারের মতো করে ভাবতে পারলে তা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি রিপোর্টের জন্ম দেবে এবং রাজনীতিবিদদের করার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও এখান থেকে পাওয়া যায়।

  টক-শো এবং সরাসরি সম্প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ভোটারের কণ্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা পালন করার জন্য ভোটাররা কোন প্রশ্নগুলো রাজনীতিবিদ বা প্রার্থীদের করতে চান, তা জানতে চাইতে পারেন। কোনো সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় সে

সম্পর্কেও ভোটারদের কাছে উপস্থাপক জানতে চাইতে পারেন। যখন প্রার্থী বা রাজনীতিবিদরা টক-শো বা সাক্ষাৎকার দিতে আসবে তখন এই প্রশ্নগুলো তাদের উদ্দেশে ছুড়ে দিতে পারেন।

তবে ভোটারের কণ্ঠস্বর হওয়াই গণমাধ্যমের একমাত্র ভূমিকা নয়। গণমাধ্যমকে দল ও প্রার্থীগুলো কী বলছে তা নিয়েও রিপোর্ট করতে হয়, এমনকি সেসব বক্তব্যে জনগণের ইচ্ছের বা সমস্যার প্রতিফলন না থাকলেও গণমাধ্যমকে এসব বক্তব্য নিয়ে রিপোর্ট করতে হয়। ভোটাররাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন, তাঁরা কাকে ও কোন দলকে ভোট দেবেন।

নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের ক্ষেত্রে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের সমস্যাগুলোকে সামনে আনার সাংবাদিকরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন :

- **কমিউনিটির অনুচ্চারিত সমস্যা তুলে ধরা**

  নির্বাচন কাভারেজের পরিকল্পনার সময় যে গবেষণা করা হবে তাতে বিভিন্ন এলাকার মানুষের নানা ধরনের সমস্যার কথা উঠে আসবে। এসব সমস্যার অনেকগুলোই দেখা যায় প্রার্থী ও দলীয় এজেন্ডায় থাকে না। এসব বিষয় দল ও প্রার্থীদের সামনে তুলে ধরে সমস্যাগুলো সমাধানে তাদের অঙ্গীকার ভোটারদের জানানোর পরিকল্পনা সাংবাদিকরা নিতে পারেন।

- **জনগণের নিত্যদিনের সমস্যাগুলো তুলে ধরা**

  এমন কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো প্রতি ভোটের আগে ও পরে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। যেমন, লোডশেডিং, পানি, শিক্ষা ও বেকারত্বের সমস্যা ইত্যাদি। এসব নিয়ে শুধু দল ও প্রার্থীদের আশ্বাস নয়, বরং কীভাবে তারা ক্ষমতায় গেলে এসব সমস্যার সমাধান করবে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে হয়। এতে ভোটাররা তাদের সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

- **সবকিছুতে মনোযোগ দেয়া**

  ভালো নির্বাচন রিপোর্টিং করতে হলে রিপোর্টারকে পথে-মাঠে-ঘাটে, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ কিংবা সিনেমা হল – সবখানে বিচরণ করতে হবে; কথা বলতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সমস্যা ও সেগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে। এতে করে জনমতের স্পন্দনটা রিপোর্টার বুঝতে পারবেন।

- **নতুন ভোটারদের কথা শোনা**

  প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কিছু ভোটার থাকেন। কিন্তু শুধু এসব ভোটারের ওপর নির্ভর করে কোনো দল নির্বাচনে জিততে পারে না। দলীয় ভোটারের বাইরে অধিকাংশ ভোটার থাকেন, যাঁদের বলা হয় অনিশ্চিত ভোটার অর্থাৎ যেসব ভোটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি কাকে ভোট দেবেন। বিশেষ করে যাঁরা জীবনে প্রথমবারের

মতো ভোট দেবেন এবং যাঁরা অতীতে যাঁদের ভোট দিয়েছেন এবার তাঁদেরকে ভোট দিতে চান না, এমন ভোটারদের সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য উপস্থাপন করা গণমাধ্যমের কাজ।

- **পিছিয়ে পড়া মানুষের কণ্ঠস্বর হওয়া**

সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী যেমন, নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বক্তব্য, তাদের সমস্যা ও সেগুলোর সমাধানের বিষয়গুলো গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমস্যা যেমন, শিক্ষক, কৃষক, চিকিৎসক, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি গোষ্ঠী যাদেরকে এতদিন রাজনীতিবিদরা অবহেলা করে এসেছেন এমন গোষ্ঠীগুলোর কণ্ঠস্বর হিসেবে গণমাধ্যমকে কাজ করতে হবে। গণমাধ্যম নানাভাবে এসব অবহেলিত গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন, নারী বিষয়ে নারী নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলে, যেসব জায়গায় অনেক নারী জড়ো হন সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, বিশেষজ্ঞ – বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা মানবাধিকারকর্মীর সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। প্রয়োজন হলে নারীদের মধ্যে জরিপ করে তাঁদের সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরা যায়। নারীদের এসব প্রশ্ন সব দলের নেতাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে নারীরা তুলনামূলক আলোচনা করে ভোট দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৭. নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন

নির্বাচনী প্রচারের সময় সংবাদ রচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দল ও প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯১ বি অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। ২০০৮ সালে প্রণীত এ আচরণবিধি সবশেষ ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর সংশোধন করা হয়। নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী অথবা তাঁদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি আচরণ বিধিমালার ৬ থেকে ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলি অনুসরণ করবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের যেসব বিষয়ের দিকে সাংবাদিকদের খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হলো :

ক. কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান প্রদান নিষিদ্ধ

আচরণ বিধিমালার অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কোনো প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্য কোথাও অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না। এখানে আইনানুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব সময় বলতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে।

খ. সরকারি সুবিধা ব্যবহার ও সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের প্রচারকাজে নিষেধাজ্ঞা

সরকারি ডাকবাংলো, রেস্টহাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচনের সময় সরকারি ডাকবাংলো, রেস্টহাউজ ও সার্কিট হাউজ ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগে আসলে আগে পাবেন – এই নীতির ভিত্তিতে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল দলও প্রার্থীকে সমঅধিকার দিতে হবে। তবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

আচরণ বিধিমালার ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করতে পারবেন না। ২০১৩ সালের সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড যোগ করতে পারবেন না।

গ. সভা-সমিতি অনুষ্ঠানসংক্রান্ত বাধানিষেধ

আইনানুযায়ী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা এর মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী সকলের প্রচারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। সভার জন্য পূর্বানুমতি নেয়া, আইনশৃঙ্খলা ও জনচলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এমন স্থানে সভা না করাসহ বেশ কিছু বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচার চালানো আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ।

ঘ. পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহারসংক্রান্ত বাধানিষেধ

আচরণ বিধিমালার ৭ নম্বর ধারায় নির্বাচনী প্রচারের সময় কোথায় পোস্টার, লিফলেট লাগানো যাবে আর কোথায় লাগানো যাবে না, তা বলে দেয়া হয়েছে। এসব নিয়ম প্রার্থী, তাঁর অনুসারী ও দল মানছে কি না, তা খতিয়ে দেখে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন সাংবাদিকরা। বিধি অনুযায়ী, প্রচারের মাধ্যম হিসেবে দেওয়াল লিখনকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া গেট বা তোরণ নির্মাণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ঙ. যানবাহন ব্যবহারসংক্রান্ত বাধানিষেধ

কোনো প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস কিংবা অন্য কোনো যানবাহন মিছিল বা মশাল মিছিল বের করা যাবে না। নির্বাচনের কাজে আকাশযান ব্যবহারও নিষিদ্ধ।

আচরণবিধির এসব নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে মানা হচ্ছে কি না, মানা না হলে অভিযোগ কেমন জমা পড়ছে, অভিযোগগুলোর তদন্তে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা এবং আইনে উল্লিখিত শাস্তির বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করা যেতে পারে।

৮. প্রচারের সময় অনিয়ম

আচরণবিধি লঙ্ঘনের বাইরে নির্বাচনী প্রচারের সময় বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। যেমন – ভোট ক্রয়, ভয়ভীতি বা অন্য কোনো উপায়ে ভোটারদের অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটারদের ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে সাংবাদিকদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয় বা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

৯. নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ

নির্বাচনী প্রচারের ব্যয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেখানে একজন সাংবাদিকের আগ্রহ থাকতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয় খুবই গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪বি (৩এ) উপধারা অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয়সীমা ভোটার সংখ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা। আইনে আরও বলা আছে, নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে অর্থাৎ ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে কোনো নির্বাচনী ব্যয় সম্পন্ন করা যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে এ দুটি আইন হরহামেশাই লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৩ (২এ) উপধারা অনুযায়ী এটি একটি নির্বাচনী অপরাধ, যার শাস্তি অন্যূন দুই ও অনধিক সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং একই সঙ্গে অর্থদণ্ড। সংবিধানের ৬৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে নির্বাচনে অংশ নিতে অযোগ্য হয়ে পড়বেন।

সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের একটি বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণ করাও আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। নির্বাচিত প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী ফলাফলের গেজেট প্রকাশ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করবেন এবং এ হিসাবের সঙ্গে প্রার্থীর নিজের ও তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের পক্ষ থেকে হলফনামা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলের জন্যও নির্বাচনসংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব জমাদান বাধ্যতামূলক। এসব প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের হিসাবের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির যাচাই করে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট করতে পারেন সাংবাদিকরা। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হয়।

১০. নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

নির্বাচনের পুরো সময়টা ঘিরে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নির্বাচনী এলাকার নিরাপত্তা, দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ভোটারদের জন্য নেয়া বিশেষ ব্যবস্থা, নারী ও সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে

সাংবাদিকদের রিপোর্ট করা প্রয়োজন। ভোটকেন্দ্রে সহিংসতা হলে তা জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে। ফলে ভোটাররা ভোটদানে নিরুৎসাহিত হতে পারে। তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বদলির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের ভিত্তিতে করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন নির্বাচন কমিশনকে কতটুকু সহায়তা করছে সে বিষয়ে জনগণের হয়ে গণমাধ্যমকে প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হয়।

১১. প্রচার নিষেধাজ্ঞা সময়

ভোট গ্রহণের পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা ও পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা সব ধরনের প্রচার, সভা-সমাবেশ আইনত নিষিদ্ধ। এ সময়ে আচরণবিধির লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে কি না, অর্থের মাধ্যমে ভোট কেনার চেষ্টা করা হচ্ছে কি না – এসব বিষয়ে সাংবাদিকদের খেয়াল রাখতে হয়।

১২. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

ক) রাজনৈতিক দল : নির্বাচনের সময় প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করে। ভোটের দিন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তাঁদের নিজস্ব পোলিং এজেন্ট নিয়োগ দেয়। ভোট প্রদান ও গণনায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হিসেবে কাজে লাগতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রকাশ বা প্রচার করতে পারেন না। কারণ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের মাধ্যমে গুজব ছড়াতে পারেন।

খ) সুশীল সমাজ : সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন, এনজিও পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব সংগঠন থেকে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সংগঠন কোনো দলের হয়ে কাজ করতে পারে।

গ) নির্বাচনী পর্যবেক্ষক : আধুনিক নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষক খুব গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে তারা একটি স্বাধীন মত দিতে পারে। আমাদের দেশের প্রতিটি নির্বাচনে দেশি-বিদেশি প্রচুর নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসব সংস্থার সঙ্গে সাংবাদিকদের ভালো সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো কর্মী বা সদস্য কারা হচ্ছে সে সম্পর্কেও সাংবাদিকদের রিপোর্ট করার সুযোগ আছে। আবার ভোটের দিন এসব সংস্থার সদস্যরা নিজেরাই আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন কি না কিংবা কোনো বিশেষ দল বা প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছে কি না, তার ওপর সাংবাদিকদের নজর রাখতে হয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বা এ ধরনের সংস্থাগুলো একজন সাংবাদিকের জন্য ভালো সূত্র হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবে এদের দেয়া তথ্য যাচাই করা ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।

নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংবাদিকের নিরাপত্তা

নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় একদিকে যেমন উত্তেজনায় ঠাসা থাকে অন্যদিকে এ সময়ে বহু সহিংস ঘটনার আশঙ্কা থাকে। সাংবাদিকরাও এ সময় রাজনৈতিক ও প্রার্থী এবং তাঁদের কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন। অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার শিকার যেমন হতে পারেন তেমনি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে হামলাও শিকার হতে পারেন। এ কারণে নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের পরিকল্পনা করার সময় ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হয় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর কৌশলও গ্রহণ করতে হয়। The International Federation of Journalists' Safety Manual-এ বলা হয়েছে, '*no story is worth your life*'। এ আপ্তবাক্যটি প্রত্যেক সাংবাদিকের মনে রাখতে হবে।

- কখনই রাজনৈতিক দলের টি-শার্ট, ব্যাজ, স্লোগান-সংবলিত পোশাক পরিধান করবেন না।
- রাজনৈতিক দল, তার কর্মী বা প্রার্থীর কাছে কোনো সুবিধা নেবেন না। যদি কখনও রিপোর্ট করার জন্য পরিবহণসুবিধা নিতে হয়, তাহলেও আপনি নির্ভুলতা ও ভারসাম্যের সঙ্গে রিপোর্ট করবেন।
- কাজের নামার শুরুতেই পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে রাখুন।
- কখনই অস্ত্র বহন করবেন না।
- কোনো সাংবাদিকের কাছে যদি কোনো ঘটনা কাভার করা ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক মনে হয়, তাহলে তিনি কাভার করতে অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন। কোনো অবস্থায় নিজেকে বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না।
- যে-কোনো হামলা বা হুমকি সম্পর্কে আপনার অফিস বা সহকর্মীকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন। সাংবাদিকদের ওপর যে-কোনো ধরনের হামলা বা হুমকি বিষয়ে সকল গণমাধ্যমকে সংবাদ করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দাবি করতে হবে।
- আপনার সম্পাদক, সহকর্মী কিংবা পরিবারকে জানিয়ে যাবেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কখন ফিরে আসবেন।
- হুমকির বিরুদ্ধে একজন রিপোর্টারের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ হলো তাঁর কাজটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং তিনি কোনো পক্ষাবলম্বন করেননি। রিপোর্টিংয়ে উভয় পক্ষের ভাষ্য থাকলে পাঠক তাঁর নিজের বোধবুদ্ধিতে কোন পক্ষটি ঠিক আর কোনটি ভুল তা বাছাই করে নেবেন।

আক্রান্ত হলে

সাধারণভাবে গণমাধ্যম, ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট কোনো গণমাধ্যম – প্রতিষ্ঠান এবং অনেক সময় কোনো সাংবাদিক রাজনৈতিক দল, নেতা কিংবা বক্তা কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারেন। কোনো রাজনৈতিক নেতার বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের কারণে তাঁর দলের নেতা-কর্মী ওই সাংবাদিক কিংবা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্ষুব্ধ হতে পারেন, এমনকি শারীরিকভাবে ওই সাংবাদিক কিংবা

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রহৃত হতে পারেন। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি উদ্ভব হয়, তাহলে আপনি নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন :

- শান্ত থাকা
- ক্ষুব্ধ সমর্থকদের উদ্দেশে চিৎকার না করা
- ভয় না পাওয়া কিংবা ভয় পেয়েছেন এমন কোনো লক্ষণ না দেখানো
- যতটা সম্ভব আপনার কাজ আপনি করে যাবেন, নোট নেবেন বা ছবি বা শব্দ ধারণ করবেন
- যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর মনোযোগ আকর্ষণ করা, যাতে আপনি আপনার কাজ শেষ করতে পারেন
- আপনার চারপাশের ও আশপাশের লোকজন সম্পর্কে সচেতনভাবে নোট নিন
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেয়া মিডিয়া পাশটি সঙ্গে রাখুন, প্রয়োজন হলে তা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন
- আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে, এমন কোনো অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি না নেয়া।

ভোট গ্রহণ ও ফলাফল কাভারেজ

নির্বাচন রিপোর্টের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি হলো ভোটের দিন। যে-কোনো নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্যায় হলো ভোট গ্রহণ, গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা। এ মুহূর্তটির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত সকল পক্ষ অপেক্ষায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভোটের দিন অর্থাৎ ভোটদান থেকে শুরু করে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সংবাদগুলো হয়ে থাকে। গণমাধ্যমকেও এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা দিতে হয়, যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এবং প্রতিটি ব্যালট স্বচ্ছতার সঙ্গে গণনা করা হয় এবং ফলাফলে কোনো ধরনের কারচুপি করা না হয়। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, দু-একটি ভোটকেন্দ্রে কারচুপির অর্থ এই নয় যে পুরো দেশের নির্বাচন-প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ ও অবৈধ। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যালট পেপার গণনার নির্ভুল হিসাব তুলে ধরতে হবে। অসত্য ও ভুল রিপোর্ট সারা দেশে উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে। ভোটিং প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিবেদক কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

ভোটের দিনের সাংবাদিকতা একেবারেই ভিন্ন। অসংখ্য ভোটকেন্দ্রের কারণে ভোটের দিনে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা সাংবাদিকের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং বিষয়। ভোটের দিন সংবাদ লেখার চেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অফিসে তথ্য দিতে হয়। অর্থাৎ ব্রেকিং নিউজ কিংবা ঘটনার আপডেট দেয়ার পেছনেই বেশি ছুটতে হয়। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে ভুল হলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। নির্বাচনে গণমাধ্যমে সজাগ দৃষ্টি এ ঘটনাগুলো কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। নির্বাচনের সময় ভোটের দিনটিকে দুটো অংশে ভাগ করা যায় :

১. ভোট গ্রহণ

২. ফলাফল ঘোষণা

ক) ভোট গ্রহণের রিপোর্ট

ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হয় :

- সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলবে। ঠিক সময়মতো ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে কি না।
- সব প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উপস্থিত কি না। তারা কি তাদের কাজ ঠিকভাবে করতে পারছে? তারা কি নির্বাচন কমিশন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাজে হস্তক্ষেপ করছে?
- কোনো প্রার্থী বা দলের এজেন্টকে ভয়ভীতি, হুমকিধমকি দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে কি না।
- কোনো এলাকার ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়া হয়েছে কি না।
- ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে পারছে কি না।
- ভোটকেন্দ্রের বাইরে লাইন কেমন, ভোটারদের উপস্থিতি কেমন?
- ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্রের কাছাকাছি নির্বাচনী প্রচার কাজ কী চলছে? এসব প্রচারকেন্দ্র থেকে কি ভোটারদের হুমকি বা ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে?
- কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কারও নিজস্ব পরিবহণের মাধ্যমে কি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনা হচ্ছে?
- নির্বাচন কমিশন থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, এমন কোনো ব্যক্তি বা বাহিনী কি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত আছে? যদি থাকে, তারা কি নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব খাটাচ্ছে বা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করছে?
- ব্যালেট পেপারের মুড়িপত্রে স্বাক্ষর, আঙুলের ছাপ যথাযথভাবে নেয়া ও ভোটারের আঙুলে কালি লাগানো হচ্ছে কি না।
- ভোটাররা কি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছেন? তাঁদের ভোট প্রদানের সময় কি গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে? ব্যালট বাক্সগুলো ঠিকভাবে সিলগালা করা হয়েছে কি না।
- প্রতিটি ভোট দানে কত সময় লাগছে? ভোট গ্রহণের গতি কি ধীর? তাতে কি ভোটাররা বিরক্ত হচ্ছেন?
- বুথে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে কোনো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য প্রভাবিত করা হচ্ছে কি?
- প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ভোটারদের সাহায্য করার অজুহাতে নিজ দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়া হচ্ছে কি?
- ব্যালট পেপারের মতো দেখতে নকল ব্যালট পেপার নিয়ে কেউ কি কেন্দ্রে ঢুকছে?
- ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের প্রতিটি বইয়ের মুড়িপত্রে প্রথম ক্রমিক নম্বর ও সর্বশেষ মুড়িপত্রের ক্রমিক নম্বরটি লিপিবদ্ধ করে রাখুন।
- ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যার বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে কি?

- ভোটার তালিকায় নাম নেই এমন কেউ কি ভোটকেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করছে?
- সংশ্লিষ্ট ভোটার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা, কাগজপত্র চুরি করা, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ আছে কি বা এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কি?
- ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে প্রার্থী ও এজেন্টের বা কোনো ভোটারের কোনো অভিযোগ আছে কি?
- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কোনো অভিযোগ আছে কি?
- জাল ভোটসংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আছে কি?
- দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কোনো অভিযোগ বা মতামত আছে কি?
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসেও কেউ কি ভোট দিতে ব্যর্থ হয়েছেন?

ঢাকা-১৮ তে মিনিটে ১৮ ভোট!

ঢাকা-১৮ (উত্তরা) আসনে সারা দিন ভোটারের দেখা মেলেনি, কিন্তু শেষ ঘণ্টায় এসে প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮টি করে ভোট পড়েছে তিনটি কেন্দ্রে।

অবিশ্বাস্য এ ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণখান এলাকার কাওলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত তিনটি নারী ভোটকেন্দ্রে (১০২, ১০৩ ও ১০৪)। এখানে মোট ভোটার সাত হাজার ৩৪৪ জন। দিনভর এ তিন কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন এই প্রতিবেদক। বেলা সাড়ে নয়টায় প্রিজাইডিং কর্মকর্তার দেয়া তথ্য মতে, এখানে ভোট পড়ে মাত্র ২১টি।

দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ মোট ৩৬৬ জন ভোট দেন। বেলা ২.৩০টায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯৪-এ। এরপর শেষ দেড় ঘণ্টায় ঘটেছে বিস্ময়কর ঘটনা। এই সময়কালে কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদক দেড়'শর মতো ভোটারকে আসতে দেখেন। কিন্তু বেলা চারটায় ভোটগ্রহণ শেষে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা জানান, এখানে মোট ভোট পড়েছে দুই হাজার ১৭৭টি। অর্থাৎ শেষ দেড় ঘণ্টায় ভোট পড়েছে এক হাজার ৫৮৩টি। মিনিট হিসাবে প্রতি মিনিটে ভোট পড়েছে প্রায় ১৮টি। এর আগে বেলা ১১টা ও ৩টা দুই দফা কেন্দ্রের পাশে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের কারণে সেখানে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য ।

ঢাকা-১৮ আসনে প্রার্থী হলেন দুজন। তাঁরা হলেন আওয়ামী লীগ-এর সাহারা খাতুন ও বিএনএফ-এর (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) আতিকুর রাহমান। দিনভর এ আসনের বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্র ঘুরে কোথাও ভোটারের দীর্ঘ সারি চোখে পড়েনি। উত্তরার নবাব হাবিবুল্লাহ কলেজ কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ১০টায় দেখা গেছে, সেখানকার তিনটি কেন্দ্রের ১৮টি বুথের মধ্যে ১৫টি বুথে মোট ভোট পড়েছে ১১৮টি। বাকি তিনটি বুথে

তখন পর্যন্ত একজনও ভোট দিতে যায়নি। আর দক্ষিণখান এলাকার গাওয়াইর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে বেলা একটা পর্যন্ত ভোট পড়ে মাত্র ৬ শতাংশ এর মত।

দুপুরে সিভিল এভিইয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি বুথে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ক্যাম্পের স্লিপ হাতে বেশ কিছু কিশোর। তারা সবাই ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে। আলোকচিত্র সাংবাদিক ছবি তুললে সেখানকার সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দ্রুত এসব কিশোরকে বুথ থেকে সরিয়ে দেন। আরও কিছু কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকের কাগজ হাতে নিয়ে কিশোর বয়সী অনেককে ভোট দিতে দেখা গেছে। কোন কেন্দ্রে বি এনএফএর প্রার্থীর কোন পোলিং এজেন্ট দেখা যায়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আজমপুর, টঙ্গি ব্রিজ, গাওয়াইর এলাকায় ৩০টির মতন ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এ রিপোর্টটিতে ভোট গ্রহণের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভালোভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে রিপোর্টার তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি হাতিয়ার বা টুলস ব্যবহার করেছেন, সেটি হলো পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ তিনি নিজে সারা দিনে যা দেখেছেন তা লিখে গেছেন। এ ধরনের রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যে কেন্দ্রে তিনি অনিয়মের কথা বলেছেন সে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা এবং অনিয়মের সঙ্গে জড়িত কারও বক্তব্য নেননি। এমনকি তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার মতো কোনো সূত্রের উল্লেখ রিপোর্টে পাওয়া যায় না। যেমন, ৩০টি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়, রিপোর্টার সব জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের সময় ছিলেন না। তাহলে ৩০টি মতন ককটেল বিস্ফোরণের সূত্র কি? সূত্রের উল্লেখ ছাড়া উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন যে-কেউ তুলতে পারেন।

ভোট গ্রহণের অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তথ্যের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সকল পক্ষের মতামতসহ একটি ভালো রিপোর্টের উদাহরণ হিসেবে নিচের রিপোর্টটির কথা বলা যায়।

মিনিটে ৭.৬৬ ভোট

কিশোরগঞ্জ তাড়াইল উপজেলার কাজলা আলিম মাদ্রাসা কেন্দ্রে বেলা একটা পর্যন্ত ৩০০ মিনিটে ভোট পড়েছে এক হাজার ৮০০টি। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ছয়টি ভোট পড়েছে। একই সময়ে পাশের কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট পড়ে দুই হাজার ৩০০।

অর্থাৎ মিনিটে ৭.৬৬ ভোট পড়েছে। এই দুইটি কেন্দ্র জাতীয় সংসদের কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-আড়াইল) আসনের। গতকাল রোববার দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওই দুটি কেন্দ্রে বেলা একটায় গিয়ে এ চিত্র পাওয়া গেছে। কেন্দ্র দুটি ওই আসনে প্রার্থী ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হকের (চুন্নু) বাড়ির কাছে। একই সময়ে করিমগঞ্জ ও তাড়াইলের কয়েকটি কেন্দ্রে মোট ভোটের প্রায় ১০ শতাংশ ভোট পড়ে।

সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে একটা পর্যন্ত। করিমগঞ্জের জাফরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়, কিরাটন উচ্চবিদ্যালয়, সাকুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়, তাড়াইলের ঘোষপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ অন্তত ২৫টি কেন্দ্রে গিয়ে জানা যায়, এসব কেন্দ্রে ওই সময় পর্যন্ত ১০ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিন্তু মুজিবুল হকের গ্রামের বাড়ি কাজলায় গিয়ে পাওয়া যায় ভিন্ন চিত্র। কাজলা গ্রামে মুজিবুল হকের বাড়ির ১০০ গজের মধ্যে কাজলা আলিম মাদ্রাসা ও কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র। কাজলা আলিম মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোটার দুই হাজার ১১৯। বেলা একটার মধ্যে সেখানে এক হাজার ৮০০ ভোট পড়ে। কাজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন হাজার ৫৫৯ ভোটের মধ্যে বেলা একটা ১০ মিনিট পর্যন্ত দুই হাজার ৩০০ ভোট পড়ে। অথচ জাফরাবাদ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দুই হাজার ৪০ ভোটের মধ্যে পড়ে ৮১টি। নিয়ামতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেলা একটা পর্যন্ত দুই হাজার ৫১৭ ভোটের মধ্যে ২০৯ ভোট এবং নোয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন হাজার ৩০২ ভোটের মধ্যে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পড়ে ৮২৭ ভোট।

কাজলা আলিম মাদ্রাসার প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুস জানান, 'সকালে ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে চলে গেছেন। এতে আমার করার কি আছে।' কাজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এস এম কামাল উদ্দিন বলেন, সকালে এসে দুপুরের আগেই ভোটাররা ভোট দিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। তাই একটার আগেই সিংহভাগ ভোটপ্রদান সম্পন্ন। এ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ ও এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুল হক (হরিণ প্রতীক) বলেন, '১৯৮৬ এর ভোট ডাকাতির মতন এবার ভোট ডাকাতি হয়েছে। আমার পোলিং এজেন্ট মৃত্যুভয়ে কেন্দ্রে যায়নি। শুধু ওই দুটি কেন্দ্রে নয়, করিমগঞ্জ এর ৭৮টি এবং তাড়াইলের ৪২টি কেন্দ্রে মুজিবুল হকের লোকজন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের নিয়ে ভোট ডাকাতি করেছে।' এ অভিযোগের বিষয়ে মুজিবুল হক বলেন, 'আমার বাড়ির কেন্দ্রে প্রতি নির্বাচনে ভোটাররা উৎসাহ নিয়ে সকালেই ভোট দিয়ে কাজে চলে যান। এবারের নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে আমি আমি পরাজিত হলেও এ দুটি কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ ভোট পেয়েছি।'

খ) ভোট গণনার রিপোর্ট

প্রতিটি দেশেই জাতীয় নির্বাচনে কোন প্রক্রিয়ায় ভোট গণনা করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা থাকে। প্রার্থীরা ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় কীভাবে অংশ নিতে পারেন এবং সংক্ষুব্ধ প্রার্থী কীভাবে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন ও প্রতিকার পাবেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে। নির্বাচন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ কাভারেজ দিতে চাইলে সাংবাদিকদের অবশ্যই ভোট গণনা প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট আইন এবং নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

- প্রতিটি ব্যালেট বাক্স সিলকৃত অবস্থায় গণনার কক্ষে আনা হয়েছে কি না।
- প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালেট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সাজানো হয়েছে কি না।
- প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করা হয়েছে কি না।
- ব্যালট পেপারগুলো কি ঠিকভাবে গণনা করা হয়েছে?
- ভোট গণনার বিবরণীতে সঠিকভাবে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লেখা হয়েছে কি না।
- মোট ভোটারের তুলনায় ব্যালট পেপার কি বেশি হয়েছে?
- অব্যবহৃত ব্যালট পেপারগুলো কি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং ব্যালেট পেপারের হিসাব সংশ্লিষ্ট ফরম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না।
- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মধ্যে কি কোনো ধরনের ভিন্নমত লক্ষ করা গেছে?
- রিটার্নিং অফিসারের জন্য প্রস্তুতকৃত পত্রে কি ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে?
- নির্বাচনী ফলাফল পত্রে স্বাক্ষর প্রিসাইডিং অফিসার কী করেছেন? উপস্থিত প্রার্থী বা তাদের এজেন্টরা কি স্বাক্ষর করেছেন?
- নির্বাচনী ফলাফলের কপি প্রার্থীর এজেন্টকে দেয়া হয়েছে কি না এবং ভোটকেন্দ্রে টাঙানো হয়েছে কি না।

ঘ) একটি আসনের সমন্বিত ফলাফল প্রকাশ

একটি আসনে অনেকগুলো কেন্দ্র থাকে। সবগুলো কেন্দ্রের ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে আসনের পূর্ণাঙ্গ ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কিছু বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় :

- প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স ও ভোটের ফলাফল পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি নেয়া হয়েছে?
- নির্বাচনের ফলাফল, ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের অফিসে যাওয়ার পথে ছিনতাই বা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে কি?

- নির্বাচনী মালামাল/বস্তা যথাযথভাবে সিলগালা অবস্থায় আছে কি?
- রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ভোটের সমন্বিত ফলাফল ঘোষণার সময় দলীয় প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত আছেন কি?
- তাদের কাজে কি কেউ হস্তক্ষেপ করছে?
- রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পর উক্ত ফলাফলের কপি প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে দেয়া হয়েছে কি?

ঙ) ফলাফল ঘোষণা

সবশেষে সংগৃহীত ফলাফল ঘোষণার সময় তাড়াহুড়া করবেন না। নির্বাচনের রাতে প্রথমেই প্রাপ্ত ফলাফল তুলে দিলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফল থেকে প্রতিবেদন তৈরি করে বহু গণমাধ্যম পরে লজ্জায় পড়েছে, এমন নজির বিশ্বে অনেক। থমসন ফাউন্ডেশন বিষয়টিকে তুলে ধরেছে এভাবে, *The history of election reporting is full of anecdotes on some media announcing prematurely the (wrong) results and being ashamed for years to come.* (Marthoz & White, 2013, p. 7)। সে কারণে সকল দল ও ভোটারের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ফলাফল ঘোষণা সাংবাদিকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক টেলিভিশন ও অনলাইন পোর্টাল হওয়ায় এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নির্বাচনের দিনে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পর থেকেই। একদিকে অফিসের তাড়া অন্যদিকে অন্যান্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসুস্থ প্রতিযোগিতা – এ দুয়ে চরম বিপদ ডেকে আনে সাংবাদিকদের জন্য। ২০১৩ সালে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাঝরাতে খবর প্রচার করে বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজার ভোট আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী পেয়েছেন ৩ লাখ ১২ হাজার ভোট। অর্থাৎ বিএনপি প্রার্থী ১ লাখ ৫৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছে। অথচ সকালে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে ফলাফল ঘোষণা করলে দেখা যায়, ভোটের ব্যবধান ১ লাখ ৬ হাজার ৫৭৭ ভোট (আমিন, ২০১৩, পৃ. ৩২)।

চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে যে-কোনো ধরনের ভুল বা মিথ্যা তথ্য হানাহানি ও মারামারি বাধিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে মৌলিক নিয়ম হচ্ছে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে সাংবাদিক কোনো ফলাফল প্রকাশ বা প্রচার করবে না। বিশ্বের অনেক দেশে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন আছে এবং এই নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে সাংবাদিক ও সংবাদ-প্রতিষ্ঠানকে শাস্তিও পেতে হয়। ফলাফল সংগ্রহ করতে গিয়ে রিপোর্টাররা অনেক সময়ই নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। কখনও দলীয় এজেন্ট, কখনও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, আবার কখনও প্রিসাইডিং অফিসার কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে দেখা যায়। এভাবে নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে বিপদের আশঙ্কা বেশি থাকে। কারণ বিভিন্ন সূত্র থেকে একই

কেন্দ্রের ফলাফল বারবার পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে ভোটারের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। নির্বাচনী ফলাফল একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় রিপোর্টারকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে যথাযথভাবে যাচাই করে উপস্থাপন করতে হয়।

সাংবাদিকরা ভোট গণনার সময় সেখানকার পরিবেশ কেমন আছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করতে পারেন। যেমন, কতজন লোক উপস্থিত আছে, নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ভোট গণনা করা হচ্ছে কি না – এসব নিয়ে তথ্য দেয়া যায়। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কাভারেজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় :

- ফলাফল ঘোষণায় কি অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটছে?
- চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে কি দলীয় প্রতিনিধিরা সহমত পোষণ করেছেন?
- নির্বাচনের দিন ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে কি গেজেটে প্রকাশিত ফলাফলের কোনো অমিল আছে?

অধ্যায় ৯

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজ/রিপোর্টিং

- সহিংসতা
- নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্ত
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন
- পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদন
- উপনির্বাচন
- নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের তদন্ত

নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজ/রিপোর্টিং

ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কাভারেজ শেষ হয়ে যায় না। একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান ও তার চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজের সময়সীমা শুরু হয় এবং পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত এ সময়সীমা বিস্তৃত।নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় ও ভোটের দিনের মতই এ সময়টি রিপোর্টারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে রাখতে হবে নির্বাচন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা এক দিনের বিষয় নয়, বরং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নির্বাচন-পরবর্তী সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে গভীর মনোযোগ এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে এ সময়ে সংবাদ করতে হয়। গণমাধ্যম ভোটিংয়ের গতি-প্রকৃতি, জনপ্রিয়তা কোন দিকে ঝুঁকল এবং এর পেছনে কারণগুলো কী কী ও নির্বাচনী ফলাফলে নাগরিকদের সন্তুষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন করতে পারে। বিজয়ী দল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যম তাদের সামনে প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরতে পারে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে কাভারেজের ক্ষেত্রে যে ইস্যুগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হলো :

১. সহিংসতা

আমাদের দেশে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কা থাকে। নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষ আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পরাজিত রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, নেতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব সহিংসতায় সাংবাদিকদের রিপোর্ট করতে হয়। নির্বাচিত দল ও তাদের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নির্যাতিতদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

২. নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্ত

নির্বাচনে কোনো ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পেলে সেটি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির এটি উৎকৃষ্ট সময়। যেমন, আপনি অভিযোগ পেলেন অপ্রাপ্তবয়স্করা ভোট দিয়েছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আপনি কাজে লেগে যেতে পারেন। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশনেও প্রার্থীরা বিভিন্ন অনিয়ম ও কারচুপির ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন। সেগুলোর তদন্ত ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যেসব আদেশ-নির্দেশ দেয়া হয় সেগুলো নিয়েও রিপোর্ট করা যায়। যখন কোনো নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনো আপিল করা হয় তখন সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো সে আবেদনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা এবং আবেদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায় বিস্তারিত তুলে ধরা। নির্বাচনী বিরোধ

নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালগুলো স্বাধীন কি না, আপিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে সাংবাদিকরা রিপোর্ট করতে পারেন।

৩. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য দল ও প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি কতটুকু পূরণ করেছেন সেটি গণমাধ্যমকে তুলে ধরতে হয়। এক্ষেত্রে একজন ভালো রিপোর্টার একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে নিতে পারেন। নির্বাচিত দলটি তাঁদের প্রতিশ্রুতিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কতদিনের মধ্যে পূরণ করার কথা বলেছিল, কোনটি কবে পূরণ করার কথা আছে। এসব বিষয় মাথায় নিয়ে প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি অনুসরণ করতে হবে রিপোর্টারকে।

৪. পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদন

নির্বাচনে যেসব দেশি-বিদেশি সংস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে নির্বাচনের পর তারা তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যামূলক ও নতুন করে যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যায়।

৫. উপনির্বাচন

আমাদের দেশের আইনানুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে একটি আসন রেখে বাকি আসনগুলো ছেড়ে দিতে হয়। ছেড়ে দেয়া আসনে আবারও উপনির্বাচনের প্রস্তুতি নেয় নির্বাচন কমিশন। এসব উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত ধাপে ধাপে রিপোর্ট করতে হয়।

৬. নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের তদন্ত

নির্বাচনের হলফনামায় প্রার্থীরা কত টাকা নির্বাচনে খরচ করবে তা দেয়া ছিল। বাস্তবে প্রার্থী ও দল কত খরচ করেছে, কীভাবে সে অর্থের সংস্থান করেছে এসব নিয়ে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করলে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ১০

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচনী সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলন

- সাক্ষাৎকার
- সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনী সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলন

বিশ্বব্যাপী তথ্য সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকরা চারটি টুলস বা হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হলো :

১. সাক্ষাৎকার;

২. উপাত্ত/নথিপত্র;

৩. পর্যবেক্ষণ; এবং

৪. জরিপ।

সাক্ষাৎকার সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সাংবাদিকতার মেরুদণ্ড (Sherwood, 1969, p. 110)। একটি দৈনিক পত্রিকার অধিকাংশ সংবাদই সাক্ষাৎকারভিত্তিক। অর্থাৎ এসব সংবাদে প্রদত্ত তথ্যের মূল উৎস বা ভিত্তি হলো সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার ছাড়া সংবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যায় (Metzler, 1999, p. 9)। মুদ্রণ বা সম্প্রচার, যে মাধ্যমেই হোক না কেন, সাক্ষাৎকার হলো সাংবাদিক ও প্রার্থী কিংবা সূত্রের মধ্যকার আলোচনার একটি অব্যক্ত প্রক্রিয়া – *an unspoken process of negotiation* (Brandt, et al., 2006, p. 26)। প্রার্থী বা দলীয় নেতাদের সাক্ষাৎকার হলো নির্বাচন প্রচার কাভারেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বোঝার জন্য তাঁর কাছাকাছি যেতে পারেন। তবে সফলতার সঙ্গে রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার নেয়া সহজ কাজ নয়। এর জন্য দরকার ভালো সম্পর্ক তৈরির কৌশল, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ও যথাযথ প্রস্তুতি। যে রিপোর্টার সাক্ষাৎকারদাতা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে গবেষণা করেন তিনি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে ভালো প্রশ্ন করতে পারেন এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকে। এমনকি সাক্ষাৎকার-দক্ষতা রিপোর্টারের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে – *The best interview tactics reflect the interviewer's personality, so take that into account as you develop your own repertorie (Hanson & Hunter, 2011, p. 46)*।

একটি নির্বাচনী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে হয়। যেমন, প্রার্থী, দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থক, সাধারণ ভোটার, নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইত্যাদি অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। কিন্তু এখানে মূলত বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধান প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতা কিংবা প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা অন্যান্য

কমিশনারের সাক্ষাৎকারের কথাই বলা হচ্ছে। নির্বাচনী সংবাদগল্পের এ ধরনের প্রধান চরিত্রকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকারগুলোর সফলতা চারটি মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল :

১. সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগেই তাঁরা যা জানেন সে সম্পর্কে জানুন।

২. আপনার সাক্ষাৎকারের আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানুন – কী তথ্য, সংবাদ ও প্রমাণ আপনি এ সাক্ষাৎকার থেকে পেতে চান।

৩. প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারে একই রকম আচরণ করুন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর প্রতি সমআচরণ করুন।

৪. কোনো প্রশ্ন বা উত্তর যতই কঠিন বা বিতর্কিত হোক না কেন, মৌলিক সৌজন্যতা কিংবা 'মানবীয় মর্যাদার অনুকূল' পরিবেশ বজায় রাখুন। এমনকি সবচেয়ে খারাপ দুষ্কৃতকারীও জনসমক্ষে তার মতামত তুলে ধরার অধিকার রাখে। সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো পরিষ্কার ও সততার সঙ্গে প্রশ্ন করা, যাতে উত্তরদাতা সততার সঙ্গে উত্তর দিতে উৎসাহ পান।

সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি

একটি সাক্ষাৎকারের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর সাক্ষাৎকারগ্রহীতার প্রস্তুতির ওপর। এক্ষেত্রে চারটি ধাপ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নিরূপণ

আপনার নির্বাচন রিপোর্টের কোন কোন তথ্যের জন্য অর্থাৎ কী উদ্দেশ্যে আপনি সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রিপোর্টারের পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সাক্ষাৎকারদাতাকে রাজি করানো কঠিন হতে পারে। আবার রাজি হলেও বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন – '*... if you don't know precisely what you want to ask, there is always the danger that you will run out of questions. This can be very embarrassing indeed.*' (Sherwood, 1969, p. 106)।

২. পটভূমি গবেষণা

ভালো সাক্ষাৎকারের সফলতার এক নম্বর শর্তই হলো সাক্ষাৎকারদাতা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যতটা সম্ভব গবেষণা করা। এ গবেষণার ওপর সাক্ষাৎকারদাতার মন জয় করা এবং প্রশ্নের ধরন কেমন হবে তা নির্ভর করে। ধরুন, আপনি কোনো রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কতদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত?' অথবা 'আপনি কয়বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন?' – এমন প্রশ্নে সহজেই বোঝা যাবে আপনি যাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। এতে সাক্ষাৎকারদাতা আপনার অজ্ঞতা সম্পর্কে বিরক্ত হতে পারেন।

- সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্য জোগাড় করুন। তাঁর অতীত নিয়ে গবেষণা করুন। তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় কী বলেছেন, কী লিখেছেন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করুন।
- সাক্ষাৎকারদাতার অর্থের উৎস সম্পর্কে জানুন।
- এলাকায় তাঁর জনসমর্থন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন।
- তাঁর বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর সম্পর্কে কী বলছেন জেনে নিন।

৩. সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান নির্ধারণ

নির্বাচনের সময় প্রার্থী ও রাজনৈতিক নেতারা প্রচারকাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রচারকাজের ফাঁকে আপনি সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন ছুড়ে দিলে তিনি সে প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। আবার এক্ষেত্রে আপনার রিপোর্টের আইডিয়াটি সম্পর্কে অন্য সাংবাদিকরা ধারণা পেয়ে যেতে পারেন। একজন প্রতিবেদক হিসেবে কখনই এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, আপনাকে যে-কেউ যে-কোনো সময় সাক্ষাৎকার দিতে বাধ্য (ফেরদৌস, চৌধুরী ও হক, ২০১৫, পৃ. ১৪৯)। সেজন্য ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেয়ার ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে আপনাকে রাজি করাতে হবে, উপযুক্ত সময় এবং স্থান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতার বাসা বা অফিস হলে ভালো হয়; কারণ এতে তিনি এক ধরনের মানসিক নিরাপত্তা বোধ করেন।

৪. সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন সাজানো

সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে রিপোর্টার এক্ষেত্রে নিজেকে ঝালিয়ে নেবেন। এ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারদাতার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে সে ব্যাপারে নথিপত্র জোগাড় করা। এখানে প্রশ্ন সাজানো বলতে প্রশ্নের একটি ফর্দ তৈরি করাকে বোঝানো হয়নি। বরং আপনি সাক্ষাৎকারে যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবেন সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে যাতে প্রশ্ন করতে পারেন সেজন্য আলোচনার বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা নেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

- সহজ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ লম্বা ও দীর্ঘ প্রশ্ন একঘেয়েমি তৈরি করে। এ ধরনের প্রশ্ন করলে ঝানু রাজনীতিবিদরা সাক্ষাৎকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে।
- প্রার্থীর এলাকার সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিতে হবে। সমস্যাগুলো কতদিনের, কেন এতদিন সমাধান হয়নি, তিনি আগেও কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে।

সাক্ষাৎকার পরিচালনা

নির্ধারিত সময় ও স্থানে মার্জিত এবং রুচিশীল পোশাক পরে রিপোর্টারকে হাজির হতে হবে। মনে রাখবেন, নির্বাচনী প্রচারের প্রত্যেকটি মুহূর্ত প্রার্থী ও দলীয় নেতাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে আপনি যদি দেরি করেন, তাহলে সাক্ষাৎকারদাতার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিণত হতে পারে। নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, তিনি কোনো বস্তু বা অতিথি কিংবা খ্যাতিমান ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন না, বরং একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন যিনি তাঁর এলাকার মানুষের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দেবেন। সাক্ষাৎকার পরিচালনা স্তরে বেশ কয়েকটি ধাপ আছে। সেগুলো হলো :

১. শীতল সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠা

প্রার্থী বা সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ আপনার পূর্বপরিচিত হতে পারে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনের সময় সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় রাজনীতিবিদদের মন খচখচ করে। সেক্ষেত্রে আপনি প্রথমেই যদি আপনার সবচেয়ে মোক্ষম বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছুড়ে দেন, তাহলে সাক্ষাৎকারদাতা ভড়কে যেতে পারেন। সেজন্য ধীরে ধীরে কিছু ব্যক্তিগত ইতিবাচক প্রশ্ন করে তার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ একটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারকে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে পরিণত করতে হবে। জমিয়ে তুলতে হবে আলাপচারিতা, তাহলে রিপোর্টার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি সহজেই বের করে আনতে পারবেন। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হলো সাক্ষাৎকারে বিদ্যুতের প্রবাহের মতো যা পুরো সাক্ষাৎকারে একটি দারুণ গতি সঞ্চার করে। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় রিপোর্টারকে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। সেগুলো হলো :

- সংবাদপত্র ও অনলাইন সাংবাদিকরা নিরাপত্তার জন্য টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করতে চান। কিন্তু টেপ-রেকর্ডার ব্যবহারের আগেই অনুমতি নিয়ে নিন।
- আলোচনার প্রতি গভীর মনোযোগ দিন। বক্তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সে অনুযায়ী পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে হবে।
- যখন সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু জানতে চান তখন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সামনের দিকে তাকান।
- এমনভাবে বসুন, যাতে সাক্ষাৎকারদাতা যাতে বোঝেন যে আপনি খুব মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করছেন। জবুথবু হয়ে বসবেন না, মোচড়াবেন না। চেয়ার ঘোরাবেন না এবং হাই তুলবেন না।
- নোট নিন, কিন্তু এমনভাবে নোট নেবেন না, যাতে মনে হয় আপনি বক্তার কথার চেয়ে লেখার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করছেন।
- সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার স্তরে কোনোভাবেই সাক্ষাৎকারদাতার আত্মমর্যাদায় আঘাত করা যাবে না।
- যদি কোনো কিছু আপনি বুঝতে না পারেন, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ জিগ্যেস করুন। যদি সাক্ষাৎকারদাতা অপ্রত্যাশিতভাবে চমকপ্রদ কিছু বলে ফেলেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ এ সম্পর্কে ফলো-আপ প্রশ্ন করুন। অপেক্ষা করবেন না। কোনো ভুল-বোঝাবুঝি দূর করতে বা চমকপ্রদ তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করুন।

- সাক্ষাৎকারদাতা যখন কথা বলবেন তখন চোখের মাধ্যমে যোগাযোগ বা আই-কন্ট্রাক্ট রক্ষা করুন এবং মাঝে মাঝে মাথা ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপনি যে তাঁর কথা বুঝতে পারছেন সেটা নিশ্চিত করুন। তবে এ পদ্ধতি তখনই কার্যকর হয় যদি আপনি তাঁর কথা সত্যি বুঝতে পারেন।

২. মূল প্রশ্নগুলো জিগ্যেস করা

সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে সাক্ষাৎকারের মূল বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ পর্যায়ে রিপোর্টার ধীরে ধীরে স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেবেন। তবে মনে রাখতে হবে, স্পর্শকাতর প্রশ্ন করার অর্থ এই নয় যে, আপনি নোংরা বা অশ্লীল প্রশ্ন করবেন কিংবা অযাচিতভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন। স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবিলা করে প্রশ্নের মোক্ষম উত্তর বের করে আনাটাই হলো রিপোর্টারের কৃতিত্ব (ফেরদৌস, চৌধুরী ও হক, ২০১৫, পৃ. ১৭৩)।

কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কীভাবে? – এই ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন বা ষড়-ক-এর ভিত্তিতে রিপোর্টরা তাঁদের রিপোর্ট করে থাকেন। এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর রিপোর্টে থাকে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকারে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে ভালো রিপোর্ট তৈরি করা যায়। এগুলো হলো : কী, কীভাবে এবং কেন? উদাহরণস্বরূপ, একজন সাংবাদিক যদি একজন রাজনীতিবিদকে জিগ্যেস করেন – শহরের পথে সুয়ারেজ লাইন ঠিক করার জন্য আপনার দল কী করেছে? এই শহরের মানুষ দীর্ঘদিন যেখানে আপনার সরকারের কাছ থেকে অবহেলার শিকার হয়েছে, সেখানে কীভাবে এই সমাধান ভবিষ্যতে সম্ভব? কেন এই শহরের মানুষ বছরের পর বছর ধরে সুয়ারেজ ও নিরাপদ পানীয় পায়নি?

রিপোর্টারের সাক্ষাৎকারের ছক ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশ্নগুলোর মোক্ষম উত্তর বের করে আনার জন্য তাঁকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেগুলো হলো :

- সহজ ও স্পষ্টভাবে প্রশ্নগুলো তুলে ধরবেন। একাধিক বা দুটি প্রশ্ন একসঙ্গে করবেন না। রাজনীতিবিদ দুটির মধ্যে সহজটি বেছে নেবেন এবং শুধু ওই প্রশ্নটিরই উত্তর দেবেন। যদি আপনি প্রশ্ন করেন, "জনাব 'ক'-এর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক এবং তাঁর কি ক্ষমতায় আসার কোনো সম্ভাবনা আছে?" – এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতা শেষ প্রশ্নটির উত্তর দেবেন। কারণ এটি শেষে করেছেন এবং সম্ভবত এর উত্তর দেয়া অনেক সহজ। একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর সে-সম্পর্কিত সম্পূরক প্রশ্ন করা উচিত। না হলে বক্তার মধ্যে সংশয় দেখা দিতে পারে।

- বদ্ধ প্রশ্ন কম করে উন্মুক্ত প্রশ্ন বেশি করুন। বদ্ধ প্রশ্ন হলো সেসব প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর যে-কোনো প্রার্থীর পক্ষে চিন্তা করে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আর যে প্রশ্নগুলোর উত্তর চিন্তা করে দেয়া যায় সেগুলো হলো উন্মুক্ত প্রশ্ন। রিপোর্টার সব সময় প্রশ্ন করে থাকেন। তবে সব সময় যে উত্তর পান তা কিন্তু নয়। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপায় বা কৌশল হলো উন্মুক্ত প্রশ্ন করা। কারণ এখানে 'হ্যাঁ' বা 'না'-

এর মাধ্যমে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। উন্মুক্ত প্রশ্নগুলো শুরু হয় কী, কেন ও কীভাবে দিয়ে। এসব শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করার অর্থই হলো ব্যাখ্যাসহ প্রশ্নের উত্তর দেয়া। আপনি নির্বাচিত হলে কীভাবে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি দেবেন? এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার সংস্থান করবেন কীভাবে? যদি বিক্রেতারা দাম না কমায়, তাহলে আপনি কী করবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কোনো রাজনীতিবিদের পক্ষে তাঁর মুখ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়, বরং দীর্ঘ উত্তর দিতে হয়।

- লিডিং বা ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাবে না। অর্থাৎ এমন প্রশ্ন করা যাবে না যার উত্তর দিলে মনে হবে সাংবাদিক ঠিক আর উত্তরদাতা ভুল। যেমন, 'আপনি কি মনে করেন না যে...' অথবা 'আপনার কি এটা করা উচিত নয়'। এ ধরনের প্রশ্ন খুব ঝুঁকিপূর্ণ – *Asking a leading question is risky. On the one hand, it may prompt a provocative and dramatic answer that could make for a great television moment. On the other hand, it could irk the interviewee and make them calm up.* (Coronel, 2009, p. 166)।
- কোনো প্রশ্নের মধ্যে নিজের মতামত দেবেন না। এটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সরবরাহকে থামিয়ে দেয়। বরং বক্তাকে তার মত প্রকাশ করতে দিন।
- এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না, যাতে অনুমাননির্ভর উত্তর দিতে হয়।
- স্পর্শকাতর বা উত্তেজক কোনো শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করবেন না। যেমন, 'একজন কট্টরপন্থি হিসেবে আপনি কীভাবে এটি করলেন' – এ ধরনের প্রশ্ন আপনার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে। সাক্ষাৎকারদাতা আপনার 'কট্টরপন্থি' শব্দটিকে অপছন্দ করতে পারেন এবং তার অবস্থানের ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করবেন এবং এতে আপনি আপনার আসল প্রশ্নটি করার সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন।
- পক্ষপাতমূলক শব্দ ব্যবহার করবেন না। যেমন, 'অমুক দলের সঙ্গে বৈঠক আপনি কেমন উপভোগ করেছেন?' তার পরিবর্তে প্রশ্ন করুন, 'অমুক দলের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন?' ভালো সাক্ষাৎকারগ্রহীতার উদ্দেশ্য থাকে উত্তরদাতার কাছ থেকে মোক্ষম উত্তরটি বের করে আনা। বলা হয়, *A good interviewer is scrupulously neutral, revealing nothing about themselves but getting the candidate to reveal a great deal.* (Brandt, et al., 2006, p. 27)।
- খুব বেশি দীর্ঘ ও লম্বা প্রশ্ন করবেন না, ছোট ছোট প্রশ্ন জিগ্যেস করুন। আপনি যদি বড় একটি বিবৃতিসহ প্রশ্ন শুরু করেন, তাহলে রাজনীতিবিদ সে বিবৃতির ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য দেবেন, তিনি আপনার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবেন। ছোট প্রশ্নগুলো স্পষ্ট হয় আর তাতে উত্তরগুলোও স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থাকে না।

সাক্ষাৎকারের ইতি টানা

যেভাবে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার শুরু করেছিলেন সেভাবে একটি ভালো ইতি টানার চেষ্টা করতে হবে। এটি ভবিষ্যতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে প্রার্থী বা রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ভবিষ্যতেও তিনি আপনার সোর্স হতে পারেন। সেজন্য একটি ভালো ইতি টানার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয় :

- সাক্ষাৎকার শেষ করার আগে একনজরে ভেবে নিন, এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে কি না।
- সাক্ষাৎকারদাতার এমন কোনো কথা বা তথ্য কী আছে, যা আপনি বুঝতে পারেননি অথবা তা নিয়ে সন্দেহ আছে কি? যদি থাকে, তাহলে তা যাচাই করে নিন।
- ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিন।

অফ দ্য রেকর্ড

মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে অনেক প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের নেতা অনেক সময় রিপোর্টারকে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর তথ্য দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারেন এটা 'অফ দ্য রেকর্ড'। অর্থাৎ তিনি তাঁর নাম-পরিচয় উল্লেখ করে এ তথ্যটি প্রকাশ হোক তা চান না। সেক্ষেত্রে রিপোর্টারের কাজ হলো তথ্যটি ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ে অন্যান্য উৎস বা সূত্রের মাধ্যমে তথ্যটি যাচাই করা। কিন্তু কোনো সাক্ষাৎকারদাতা যদি কোনো তথ্যের জন্য তার নাম ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, সেক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অবশ্যই সোর্সের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তবে নির্বাচন একটি স্পর্শকাতর সময় হওয়ায় নাম-পরিচয়হীন তথ্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক রিপোর্টেই বেনামি সূত্রের উল্লেখ থাকে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হলো, খুবই অস্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে একক সূত্র হিসেবে কোনো বেনামি সূত্রের মাধ্যমে রিপোর্ট করা যাবে না।

নির্বাচনসংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবাদ সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী, নির্বাচন কমিশন, সরকার ও প্রশাসন, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তথ্য দিলে তা সব ধরনের গণমাধ্যমে একসঙ্গে প্রচার বা প্রকাশ হয়, সর্বোচ্চসংখ্যক জনগণের কাছে তথ্যটি পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে। মূল উদ্দেশ্য জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহ করা হলেও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানভেদে নির্বাচনসংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। যেমন, রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা কিংবা প্রতিপক্ষের কোনো বক্তব্যের জবাব দেয়া কিংবা কোনো ধরনের অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলন করে থাকে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন ভোটারদেরকে সচেতন করতে, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ

নিশ্চিতকরণে নেয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। আবার কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান জনমত জরিপের ফলাফল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে। যে উদ্দেশ্যেই সংবাদ সম্মেলন ডাকা হোক না কেন, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ের সংবাদ সম্মেলনগুলোকে রিপোর্টারের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ সংবাদ সম্মেলন থেকে একজন রিপোর্টার শুধু তথ্যই পান না, অনেক সময় এমন কোনো ইঙ্গিত পেয়ে যেতে পারেন যার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে তিনি ভালো একটি রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন। সেজন্য একজন পেশাদার সাংবাদিককে সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে সজাগ ও যত্নবান হতে হয়।

সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি

স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, সংবাদ সম্মেলন ডাকলে সেখানে একজন রিপোর্টার যাবেন এবং আয়োজকরা যা বলেন তা নিয়ে রিপোর্ট করবেন। কিন্তু একজন সাংবাদিক কেরানি নন, তিনি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর কথা চোখ বন্ধ নিউজ করলে পাঠকের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালিত হয় না। সংবাদ সম্মেলনকে সংবাদের উৎস হিসেবে গণ্য করে তা থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংবাদটি বের করে আনাই হবে তাঁর লক্ষ্য। সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে একজন রিপোর্টারকে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয় :

- সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক কারা, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এবং কী ইস্যু নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- আয়োজকের ধরন ও ইস্যু অনুযায়ী রিপোর্টারকে প্রস্তুতি নিতে হবে।
  - ✓ রাজনৈতিক দল আয়োজক হলে দলটির ইতিহাস, সাফল্য-ব্যর্থতা, আদর্শ, শক্তি ও দুর্বলতা, নির্বাচনী নিয়ম লঙ্ঘনের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত জেনে যেতে হবে।
  - ✓ প্রার্থী আয়োজক হলে তাঁর অতীত, অর্থের উৎস, সাফল্য-ব্যর্থতা, এলাকাবাসী ধারণা, আগের নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের চিত্র, প্রতিপক্ষের অভিযোগ এসব বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।
  - ✓ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল আয়োজক হলে সংস্থা বা দলটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অতীত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, সম্ভাব্য কোনো অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে তথ্য জেনে গেলে সংবাদ সম্মেলনে অনেক ভালোভালো প্রশ্ন করা যায়।
  - ✓ নির্বাচন কমিশন সংবাদ সম্মেলন ডাকলে নির্বাচনী আইন, কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, তাদের অতীত কর্মকাণ্ড, সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে যেতে হয়।
  - ✓ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হলে সে ইস্যুটি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে যেতে হবে। ধরুন, ইভিএমের ব্যবহার সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সেক্ষেত্রে ইভিএম কী, এর ব্যবহার কীভাবে হয়,

বিশ্বের কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে এর ব্যবহার হয়, এটি ব্যবহারের সবলতা ও দুর্বলতা কী কী, এটি ব্যবহারে আইনগত কোনো বাধা আছে কি না, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আছে কি না, এ বিষয়ে দেশীয় বিশেষজ্ঞরা কী বলেন ইত্যাদি বিষয় আগে জানা থাকলে এ ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে।

- নির্বাচন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন হলে দল ও ইস্যুভিত্তিক প্রস্তুতি নিতে হবে। নির্বাচনের পর বিজয়ী ও বিজিত দল, প্রার্থী, নির্বাচন কমিশন, পর্যবেক্ষক দল ও সংস্থা সংবাদ সম্মেলন করে থাকে। এ ধরনের সংবাদ সম্মেলনে সাধারণত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ, ফলাফল ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি সংস্থা ও ইস্যুর ভিত্তিতে আলাদা আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়।

সংবাদ সম্মেলনে করণীয় ও বর্জনীয়

একজন রিপোর্টার কতটা দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পেশাদার তার পরিচয় সংবাদ সম্মেলন কাভারের মাধ্যমে বোঝা যায়। সে কারণে একজন রিপোর্টারকে সংবাদ সম্মেলনে তাঁর করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হয়। এগুলো হলো :

- যথাসময়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হতে হবে।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক হলে প্রযুক্তিগত সুবিধা, যেমন– ব্যাটারি বা মেমোরি কার্ড ইত্যাদি ঠিক আছে কি না, তা যাচাই করে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হতে হবে। পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমের সাংবাদিকরা নতুন ব্যাটারি সংবলিত সচল টেপ রেকর্ডার নিয়ে যেতে পারেন।
- টেলিভিশনের সাংবাদিককে তার ক্যামেরা-পারসনের সঙ্গে আই-কন্টাক্ট রাখতে হবে। কোন বক্তব্যটি রেকর্ড করবেন আর কোন অংশ করবেন না তা ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।
- গভীর মনোযোগের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক/আয়োজকদের বক্তব্য শুনতে হবে।
- সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে লিখিত কোনো কিছু দিলে তা দ্রুত মনোযোগের সঙ্গে পড়ে নিতে হবে। লিখিত উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দাগিয়ে নিতে হবে।
- বক্তব্য দেয়ার সময় লিখিত উপাত্তের সঙ্গে মিল আছে কি না, তা সতকর্তার সঙ্গে খেয়াল করতে হবে। যদি লিখিত উপাত্তের বাইরে কোনো কিছু বলেন, তাহলে সে সম্পর্কে নোট নিতে হবে।
- অন্যান্য সাংবাদিকের প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।
- ইতিমধ্যে করা হয়েছে, এমন কোনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। এটি করলে রিপোর্টার হাস্যরসের পাত্র হতে পারেন।

- প্রশ্নের উত্তরগুলো সম্পর্কে নোট নিন। কোনো উত্তরে অস্পষ্টতা থাকলে সম্পূরক প্রশ্ন করুন।
- যথাযথ ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করুন।
- একসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন করবেন না। একাধিক প্রশ্ন থাকলে আগেই বলে নিন একাধিক প্রশ্ন আছে, কিন্তু ছুড়ে দেবেন প্রথম প্রশ্নটি। তারপর এক-এক করে পরবর্তী প্রশ্নগুলো করুন।
- লিডিং বা ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করবেন না।
- ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করবেন না।
- ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, এমন প্রশ্ন করুন।
- অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন করে বিরক্তির উদ্রেক ঘটাবেন না।
- জানা উত্তর, মামুলি উত্তর অথবা পাশ কাটানো সম্ভব – এমন প্রশ্ন করবেন না।
- একটি প্রশ্নের উত্তর শেষ না হতেই প্রশ্ন করবেন না। এতে অন্য সাংবাদিক এবং বক্তা উভয়েই বিরক্ত হতে পারেন।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সাংবাদিকদের আক্রমণ করে কোনো কথা বলা হলেও মেজাজ হারাবেন না।

রাজনৈতিক দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা প্রেস রিলিজগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে নিউজ করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি টাইপিস্ট নন, আপনি সাংবাদিক। এসব প্রেস রিলিজ থেকে সংবাদের অ্যাঙ্গেল খুঁজে বের করুন। প্রেস রিলিজের জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষা হুবহু কপি করবেন না। সেগুলোকে সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করুন।

অধ্যায় ১১

এ অধ্যায়ে থাকছে

টেলিভিশনে নির্বাচন সাংবাদিকতা

- ভিজ্যুয়াল ফ্রেমিং
- ভিজ্যুয়াল পক্ষাপাতিত্ব
- সরাসরি প্রতিবেদন/লাইভ রিপোর্টিং
- কার্যকর উপস্থাপনা

টেলিভিশনে নির্বাচন সাংবাদিকতা

রাজনৈতিক সংবাদের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী টেলিভিশনের গুরুত্ব অনেক। সাক্ষরতার প্রয়োজন না থাকায় টেলিভিশন অন্যান্য গণমাধ্যম যেমন, সংবাদপত্র ও অনলাইন গণমাধ্যমের চেয়ে মানুষের জন্য সহজতর একটি মাধ্যম হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। উপরন্তু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা সম্ভব বলে নির্বাচনের মতো ঘটনাবহুল ইস্যুতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে তথ্য জানতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিশেষ করে, নির্বাচন ভোট গ্রহণের দিন এবং ভোটের ফলাফল জানতে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা অন্যান্য গণমাধ্যমের চেয়ে ঢের বেশি। যে-কোনো সাংবাদিকের জন্য অবশ্যপালনীয় শর্তগুলো টেলিভিশন সাংবাদিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু টেলিভিশন শব্দ ও ছবির মাধ্যম সে কারণে এ মাধ্যমের সাংবাদিকদের অতিরিক্ত কিছু বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হয়।

টেলিভিশন সংবাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর ভিজ্যুয়াল বা ছবি। মুদ্রিত সংবাদের চেয়ে ছবিসংবলিত বক্তব্য অবশ্যই মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। তথ্যের চলমান চিত্র প্রদর্শিত হওয়ায় অনেকের কাছে টেলিভিশনের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। কিন্তু এই ছবি ও শব্দের মাধ্যমে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নৈতিকতার লঙ্ঘন ঘটে থাকে বেশি। কোনো প্রার্থীর ভালো কিংবা খারাপ দিক ফুটিয়ে তুলতে সাংবাদিকরা নিয়মিতভাবে ক্যামেরা ও সম্পাদনা-কৌশল প্রয়োগ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লেন্সের মুভমেন্ট, শট সিলেকশন ও প্যাকেজ সংবাদের মাধ্যমে প্রার্থীর বিশেষ দিকটি দর্শকের সামনে তুলে ধরা যায়, যা সংবাদপত্রে হাজার শব্দ লিখেও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

ভিজ্যুয়াল তথ্যের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অবাচনিক ব্যবহারও ভিন্নমাত্রা যোগ করে। প্রার্থীদের আবেগ, তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে অনেক সময় ভোটারদের আচরণ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে (Bucy 2000)। সেজন্য বলা হয়, *Indeed, when citizens are evaluating leaders, televised portrayals are remarkably potent.* (Sullivan and Masters 1988)। গবেষণায় দেখা গেছে, জনমতকে প্রভাবিত করতে বা জনমতে গঠনে ভিজ্যুয়াল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এক্ষেত্রে দর্শক সংবাদটির কথা ভুলে গেলেও ভিজ্যুয়ালটি তার মনে থাকে (Gunter 1987)। এক গবেষণায় দেখা গেছে, নেতিবাচক কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনের বর্ণনামূলক কোনো আধেয়র চেয়ে টেলিভিশনের ভিজ্যুয়ালনির্ভর কোনো আধেয় মানুষ বেশি সময় ধরে মনে রাখতে পারে, এমনকি ছয় বা সাত সপ্তাহ পরেও দর্শকের পক্ষে সেই ভিজ্যুয়ালটি সহজে মনে করা সম্ভব হয় (Newhagen and Reeves 1992)। টেলিভিশন সংবাদে একজন প্রার্থীর যে ভিজ্যুয়াল চিত্রায়ণ হয় তা ভোটারদের আকৃষ্ট ও বিরাগভাজন করতে ভূমিকা রাখে – *Visual portrayals facilitate different levels of*

intimacy between candidates and viewers, highlight appealing or unappealing personal attributes of candidates, and have the potential to craft enduring images that affect electoral support. (Grabe and Bucy, 2009, p. 85)। নির্বাচন কাভারেজের সময় একজন টেলিভিশন সাংবাদিককে যেসব বিষয় আলাদাভাবে খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হলো :

ভিজ্যুয়াল ফ্রেমিং

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে টেলিভিশন সংবাদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভিজ্যুয়াল ফ্রেমিং। নির্বাচন সংবাদে ফ্রেমিং বলতে কোনো প্রার্থীর অবস্থান, পটভূমি বা অতীত ইতিহাস বা ভোটারদের আবেদনকে এমনভাবে তুলে ধরা, যাতে অন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো কম গুরুত্ব পায়। ভিজ্যুয়াল ফ্রেমিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ইস্যু বা বিষয়কে এমনভাবে বর্ণনা করা যায় যেখানে ওই ইস্যু বা বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মুখ্য বলে দর্শকদের কাছে প্রতীয়মান হয় – *Frames pull together the facts of a narrative, acting as the central organizing idea for making sense of relevant events and suggesting what is at issue.* (Gamson, 1989, p. 157)।

ভিজ্যুয়াল পক্ষপাতিত্ব

ভিজ্যুয়াল পক্ষপাতিত্ব হলো সচিত্র প্রতিবেদনের উপস্থাপন এমন পদ্ধতিতে করা, যাতে একজন প্রার্থীর মতাদর্শ অন্যদের চেয়ে শ্রেয়তর করে তুলে ধরা কিংবা সকল পক্ষের মতকে তুলে না ধরে একটি বিশেষ পক্ষের মতের চিত্রায়ণ করা। কম্পোজিশন বা বিন্যাসের মাধ্যমে একজন টিভি রিপোর্টার এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। Dondis (1973) বলেছেন, *Different angles and focusing techniques can structure a scene to create radically different impressions.*। ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানির নির্বাচনের সময় প্রচারিত টিভি কাভারেজের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে টেলিভিশনগুলো দু'ধরনের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের ফুটেজ ব্যবহার করত; পরিষ্কারভাবে একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হতো (Kepplinger 1982)। ক্যামেরার আই-লেভেল শট ব্যবহারের মাধ্যমে একজন প্রার্থীর পক্ষে যেমন ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন করা যায় তেমনি আই-লেভেলের ওপরের কোনো শটের মাধ্যমে তার নেতিবাচক উপস্থাপন করা যায় (Mandell and Shaw, 1973)।

সম্প্রচার সাংবাদিকতায় পক্ষপাতিত্বের একটি অন্যতম প্রধান সূক্ষ্ম উপায় হলো নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অডিও ও ভিডিও-এর বিকৃতি। এমনভাবে ফুটেজ ধারণ করা হয় কিংবা সিঙ্ক বা বক্তব্য এমনভাবে কাটা হয়, যাতে প্রার্থীর খারাপ দিকটি ফুটে ওঠে। একজন টেলিভিশন রিপোর্টারকে এ বিষয়টির দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

টেলিভিশনের জন্য নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে সাউন্ড বাইট বা বক্তার বক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আধেয়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে সাউন্ড বাইট হলো বক্তার বক্তব্যের সে অংশ, যেখানে তাকে কথা বলতে দেখা যায় ও শোনা যায়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যেহেতু সময়ের বাধ্যবাধকতা আছে সেজন্য বক্তার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সাউন্ড বাইটে তুলে ধরা হয়। রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাউন্ড বাইট সম্পাদনার মাধ্যমে পক্ষপাতমূলক রিপোর্ট করতে দেখা যায়।

ভিজ্যুয়াল পক্ষপাতিত্বের আরেকটি দিক হলো পরোক্ষ কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ফুটেজের সূত্র নিশ্চিত করা। যেমন, অনেক টিভি চ্যানেল নিজেদের মধ্যে ফুটেজ শেয়ারিং করে থাকে কিংবা কোনো ব্যক্তির মোবাইলে ধারণকৃত ফুটেজও তারা সম্প্রচার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে উৎস নিশ্চিত করা জরুরি। তবে ব্যক্তিগত কোনো সূত্র থেকে ফুটেজ পেলে সে ফুটেজ সম্প্রচারের আগে সূত্রের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার।

সরাসরি প্রতিবেদন/লাইভ রিপোর্টিং

মুদ্রণ ও সম্প্রচার সাংবাদিকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো এই সরাসরি প্রতিবেদন বা লাইভ রিপোর্টিং। নির্বাচনের মতো স্পর্শকতার ও ঘটনাবহুল বিষয়ে মানুষ সরাসরি সম্প্রচার দেখতে চায়। ঘটনাস্থলে কী হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা সরাসরি জানতে চায়। আবার অনেক সময় একটি ছোটখাটো ঘটনাকে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। সরাসরি সম্প্রচার ঘটনা সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তবে এটি সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট বা দায়িত্বও বটে। কারণ এখানে রিপোর্টার বা সাংবাদিক যা বলেন ও দেখান দর্শক তাই শুনে এবং দেখে। সরাসরি প্রতিবেদনে কোনো ধরনের সম্পাদনার সুযোগ না থাকায় এ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় রিপোর্টার নিজের অজান্তেই আপত্তিকর বা অতিরঞ্জিত শব্দ, বাক্য ব্যবহার করে থাকেন যা তার নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।

লাইভ রিপোর্টিংয়ে দুটো ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন :

ক. অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব

খ. নৈতিকতার ইস্যু

এ দুই ধরনের বাধা দূর করার জন্য টিভি রিপোর্টারদের সর্বপ্রথম দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। একজন টিভি রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, টেলিভিশন সাংবাদিকতা হলো একটি টিমওয়ার্ক। শুধু নিজের রিপোর্টিং দক্ষতা দিয়ে এখানে সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে লাইভ রিপোর্টিংয়ের আগে ক্যামেরাপারসন, প্রযোজকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে ঘটনার কাভারেজ নিয়ে একটা বোঝাপড়া থাকতে হবে। কোন স্থান থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে, সরাসরি সম্প্রচারের সময় কারো সাক্ষাৎকার নেয়া হবে কি না, প্রযুক্তিগত কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয়ে পুরো টিমের সঙ্গে একটি ছোটখাটো আলোচনা রিপোর্টারকে সেরে নিতে হয়। বিশেষ করে, ক্যামেরাপারসনকে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। কারণ রিপোর্টার দলের নেতা

হলে ক্যামেরাপারসন হলেন প্রধান সেনাপতি। একটি লাইভ রিপোর্টিংয়ের মান কতটা ভালো হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ক্যামেরাপারসনের ওপর। সরাসরি সম্প্রচারের সময় আই লেভেল ঠিক রাখা, সাউন্ড কোয়ালিটি দেখা, রিপোর্টের মাঝে মাঝে ফুটেজ দেখানো, এনজি শট হলে তা দ্রুত কাভার করা ইত্যাদি বিষয় ক্যামেরাপারসনের মুনশিয়ানার ওপরই নির্ভরশীল।

নৈতিকতার ইস্যুতে প্রশ্নবিদ্ধ না হওয়ার জন্য টিভি রিপোর্টারকে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা তার প্রাথমিক কাজ। রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, ঘটনাস্থল থেকে তথ্য দেয়ার জন্যই তিনি লাইভ রিপোর্টিং করছেন। নৈতিকতার ইস্যুতে একটি টিভি রিপোর্টারকে লাইভ রিপোর্টিংয়ের আগে ও সম্প্রচারকালীন যেসব বিষয়ে নজর দিতে হয় সেগুলো হলো :

- **যাচাইকৃত তথ্যই শুধু তুলে ধরা যাবে**

  মূল তথ্যগুলো ছোট করে আগেই একটি কাগজে লিখে নিতে পারেন। অথবা কিছু কি-ওয়ার্ড লিখে নেয়া যেতে পারে। রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, ঘটনাটি চলমান। যেটুকু নির্ভুল তথ্য তিনি পেয়েছেন শুধু সেটুকুই সরাসরি সম্প্রচারে তুলে ধরবেন। কোনো ধরনের অপ্রমাণিত বা অসমর্থিত তথ্য কিংবা গুজবের কথা তিনি তুলে ধরতে পারেন না। বিশেষ করে, ভোটের দিন গোলযোগ, সংঘর্ষ/সহিংতা এবং নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে তথ্যের নির্ভুলতা সম্পর্কে রিপোর্টারকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তা কোনোভাবেই উপস্থাপন করা যাবে না।

- **বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা**

  নিজেকে সুপারম্যান ভাববেন না। আপনি একজন রিপোর্টার। তাই দর্শক নয়, রিপোর্টের বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন। দর্শককে আকৃষ্ট করা রিপোর্টারের কাজ নয়; বরং ঘটনার নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা বা উপস্থাপনই তার একমাত্র কাজ।

- **শব্দ চয়নে সাবধানতা**

  শব্দ চয়নে ও বাক্যের ব্যবহারে শালীন হতে হবে। কোনো ধরনের অতিরঞ্জন, মানহানিকর বা বিদ্বেষমূলক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

একটি টেলিভিশনে সরাসরি রিপোর্টিংয়ে একজন রিপোর্টার বলেছেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী 'এ' দল নগরীর বেশ কিছু জায়গা থেকে নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি সরিয়ে নিয়েছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় এখনো রয়ে গেছে। অন্যদিকে নগরীরে দেওয়ালে দেওয়ালে 'বি' দলের তেমন কোনো পোস্টার, ব্যানার চোখে পড়ছে না। কারণ 'বি' দলের বেশিরভাগ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হওয়ায় তাদের পোস্টার চোখে পড়ছে না।" উপস্থাপক রিপোর্টারকে ফলোআপ প্রশ্ন করেন, 'বি' দলের কতজন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। রিপোর্টার উত্তর দেন, এ সংখ্যা শ-খানেকের বেশি হবে না।

ওপরের উদাহরণটিতে 'বেশিরভাগ নেতা-কর্মী' এ শব্দবন্ধটি অতিরঞ্জন। এ ধরনের অতিরঞ্জন রিপোর্টার ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। আবার মানহানি শব্দ কোনোভাবেই লাইভ রিপোর্টিংয়ে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, কোনো রিপোর্টার কোনো সভা, মিছিলের অগ্রভাগ থেকে লাইভ করছেন এবং সে সভা/মিছিলে প্রতিপক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টার কী বলবেন– 'গালি দেয়া হচ্ছে', নাকি 'সমালোচনা করা হচ্ছে'। নিঃসন্দেহে 'সমালোচনা' শব্দটি অনেক বেশি শালীন।

- **সাক্ষাৎকারদাতাকে হেনস্তা না করা**

  লাইভ রিপোর্টিংয়ে কখনো কখনো ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে জানা রিপোর্টারের মূল লক্ষ্য, তাকে বা তার দল/সংগঠনকে হেয় করা কখনই রিপোর্টারের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

- **ভক্সপপ নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা**

  নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় গণমানুষের ভাষ্য তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ভক্সপপ নেয়া হয়। বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য এক্ষেত্রে রিপোর্টারদেরকে সচেতন হতে হবে। যেমন, ভোটের দিন কোনো বিশেষ প্রার্থী বা দলের কর্মীদেরকে ভোটার হিসেবে বাছাই করে শুধু তাদের ভক্সপপ প্রচার করা হচ্ছে কি না তা খেয়াল রাখতে হবে।

- **নিজস্ব মতামত না দেয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী না করা**

  টিভি রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, তিনি তথ্য ও ঘটনা জানানোর জন্য সরাসরি সম্প্রচারে এসেছেন। তিনি কোনো জ্যোতিষী নন। এ ক্ষেত্রে ঘটনার ধারাবাহিকতায় আরো কী কী ঘটতে পারে, এমন ধারণা দিয়ে কোনো ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা রিপোর্টারের কাজ নয়। তবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনা বা বিষয়ের বিশ্লেষণ রিপোর্টার করতে পারেন। আবার বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই রিপোর্টার তার নিজস্ব মতামত দিতে পারেন না।

কার্যকর উপস্থাপনা

দর্শকের জন্যই সংবাদ। তারা যদি সে সংবাদ বা সংবাদের বিষয়বস্তু বুঝতে না পারেন, তাহলে এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। একজন সাংবাদিককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনেক জটিল সমস্যা ও বিষয়ের অবতারণা হয়। ব্যাপকসংখ্যক মানুষের কাছে সংবাদগুলো পৌঁছতে হবে। একজন সাংবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন। একজন সাংবাদিককে অবশ্যই জটিল সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। উপস্থাপনার নীতিমালাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো :

- একজন ভালো সাংবাদিক খুব কম শব্দে অনেক কথা বলতে পারেন, বিপরীতে কম দক্ষ সাংবাদিকরা অনেক শব্দে খুব কম কথা বলেন।

- একটি বাক্যে একটি ধারণা বা আইডিয়া থাকবে, সংক্ষিপ্ত বাক্যে সংবাদ লিখবেন।
- একটি গভীরতম প্রতিবেদন লেখার আগে একটি আউট-লাইন বা রূপরেখা তৈরি করুন। একটি রূপরেখা রিপোর্টারকে সংক্ষেপে কোনো সমস্যা বা ইস্যুকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এটি সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি খুঁজে বের করতেও সাহায্য করে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে সংবাদকে যৌক্তিক ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সবচেয়ে ভালো ধারাক্রমও রিপোর্টার নির্ধারণ করতে পারেন।

নির্বাচনী রিপোর্টে ভাষার ব্যবহার

মনে রাখতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করা হলো রিপোর্টারের অর্ধেক কাজ, আর বাকি কাজ হলো এসব তথ্য নির্দিষ্ট কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় পাঠক ও দর্শকের সামনে তুলে ধরা। এমনভাবে তুলে ধরতে হয়, যাতে পাঠক/দর্শক মনোযোগ দিয়ে তা পড়েন বা শোনেন। ভালো রিপোর্টারকে ভালো গল্পবাজও হতে হয়। উদ্ধৃতি বা মন্তব্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ভালো। তবে উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত তথ্য আবার রিপোর্টে ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ ভালো রিপোর্টারের কাজ হলো রিপোর্ট করা, পুনরাবৃত্তি করা নয়।

যে-কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে একজন সাংবাদিককে খুব সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করতে হয়। রিপোর্টার হিসেবে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি তার দুটি প্রভাব আছে – একটি ইতিবাচক যা খবরটিকে বুঝতে সাহায্য করে, অন্যটি নেতিবাচক যা মানুষকে ভুল ধারণা দেয় এবং তাদের মনে ভীতি ও সন্দেহের জন্ম দেয়। সেজন্য ভাষা হলো সাংবাদিকদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং এর যথাযথ ব্যবহার করা না গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা ব্যাপক। এ সচেতনতা বেশি দরকার নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের সময়। কারণ এ সময় রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মাঝে আবেগময়ী বক্তব্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সে কারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিহার করা বাঞ্ছনীয় :

- ভুল ও অভিযোগাত্মক শব্দ যেমন, হত্যা, গণহত্যা, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি শব্দগুলো রিপোর্টারদের পরিহার করা উচিত। এগুলো যত না তথ্য দেয় তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যদি রাজনৈতিক প্রার্থীরা এসব শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তথ্য হিসেবে নয়।
- বর্ণনামূলক শব্দ যেমন, সন্ত্রাস, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতার শিকার ইত্যাদি শব্দ পরিহার করা উচিত। কারণ শব্দে কোনো একটি পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়। এ ধরনের শব্দ শুধু কারও মন্তব্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কোনো প্রার্থী, দল বা পক্ষকে লেবেলিং করা পরিহার করা উচিত। যেমন, সন্ত্রাসী, চরমপন্থি, জঙ্গি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে ওই দল বা পক্ষকে অবমূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের শব্দ কোনো রাজনীতিবিদ ব্যবহার করলে অবশ্যই তা প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে সংবাদ লেখা

মৌলিক সাংবাদিকতা হলো গল্প বলা। আপনি আপনার কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ধারণা দেয়ার জন্য যেভাবে বলে থাকেন সংবাদ গল্পেও একইভাবে যা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে বলা হয়। যা ঘটেছে তার অর্থ ও কেন এটি ঘটেছে তাও সংবাদে বলা হয়। সংক্ষেপে মৌলিক সাংবাদিকতা হলো একটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা (an informative conversation)। ব্রডকাস্ট নিউজ অব কানাডার স্টাইল বুকে বলা হয়েছে, *For years, editors told reporters: Don't tell me about it, write it.Turn that around, and you have a good rule for the broadcast journalist: Don't just write it, TELL ME ABOUT IT.* (Boyd, 2001, 56)।

নির্বাচনী প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে – সহজ শব্দে, সংক্ষিপ্ত বাক্যে রিপোর্ট লিখতে হবে। আপনার শব্দ ও বাক্য যত বড় হবে আপনার সংবাদটি ততই মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। আপনি যতটা সহজ ও সাধারণভাবে লিখবেন ততই বেশি বোধগম্য হবে। BBC Bush House Newsrrom Guide-এর নির্দেশনাটি এরকম – *Our job is to dejargonize, to declichefy, to make everything clear, simple and concise.* (Boyd, 2001, 62)।

- নির্বাচনী প্রচার বা জনসভা বিষয়ে সংবাদ লেখার সময় সংক্ষিপ্তভাবে র‍্যালির বর্ণনা, স্থানের নাম, বক্তৃতায় তুলে ধরা বিষয়গুলো এবং সমাগত মানুষের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে হবে।

- সব সংবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে – কী? কে? কোথায়? কখন? কেন?

- অস্পষ্টতা তথ্যের বিকৃতি ঘটাতে পারে। যেমন, কোনো সাংবাদিক যদি লিখেন যে, "প্রার্থী 'ক'-এর বক্তৃতা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে"। এক্ষেত্রে ওই সাংবাদিককে অবশ্যই লিখতে হবে ওই বক্তৃতা কারা শুনেছেন বা কাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে – তারা কি দলীয় সমর্থক নাকি সাধারণ মানুষ। দলীয় সমর্থক হলে প্রশংসার কারণ সহজে অনুমেয়। কিন্তু সাধারণ ভোটার হলে তা প্রমাণ করে যে, প্রার্থী অনেক অনির্ধারিত ভোটারের মন জয় করতে পেরেছেন।

- ভুল যে-কোনো সময় হতে পারে। এ কারণে সাংবাদিককে সব সময় সংবাদ সংগ্রহ ও লিখনের সময় সতর্ক থাকতে হবে। তার নিজের মূল্যায়ন সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে।

- যে-কোনো অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করার ক্ষেত্রে সংযম ও শৃঙ্খলা হলো ভুল এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায়।

অধ্যায় ১২

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচনী জরিপ/জনমত জরিপ

নির্বাচনী জরিপ/জনমত জরিপ

The only poll that matters is that which emerges after the dust settles on Election Day.

(Grant and Gibbings, 2009, p. 27)

এটি অনেক সাংবাদিকই জানেন, কিন্তু কখনও কখনও তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। কারণ সাংবাদিক একজন রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তাঁরও আবেগ আছে। এ আবেগ কখনও কখনও ক্ষেত্রবিশেষে আংশিকভাবে হলেও প্রতিবেদককে তাঁর দৈনন্দিন কাজে নৈতিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আর নির্বাচন অনেকাংশে আবেগের খেলা। সরকারি দল চেষ্টা করে জনগণের আবেগ তাদের পক্ষে ধরে রাখতে অন্যদিকে বিরোধী দল পরিবর্তনের পক্ষে জনগণের আবেগকে নাড়িয়ে দিতে চায়। জনগণের এই আবেগ কোন দিকে যাচ্ছে তা যাচাই করতে কিংবা সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গত কয়েক দশক ধরে নির্বাচনপূর্ব জরিপ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে এ নিয়ে বেশ সমালোচনাও রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী জরিপের চর্চা এতটা বেড়েছে যে কেউ কেউ একে 'উন্মুক্ত শিল্প' (*downstream industry*) (Grant and Gibbings, 2009, p. 27) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচনের সময় দুই ধরনের জরিপ হয়ে থাকে – একটি হলো ইস্যু-কেন্দ্রিক, প্রচারের ইস্যু নিয়ে নাগরিক বা ভোটারদের মত যাচাই করা; অন্যটি হলো জনপ্রিয়তা জরিপ, যেখানে ভোটারদের ইচ্ছের প্রতিফলন বের করার চেষ্টা করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছে তা জানতে নির্বাচনে জনমত জরিপকে ব্যবহার করে থাকে। এ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় তাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে পরিবর্তন আনে। কারণ জনমত জরিপের মাধ্যমে তারা জানতে পারে কোন বিষয়গুলো তাদের জনপ্রিয়তা বাড়াবে। জনমত জরিপ ভোটারদেরকেও প্রভাবিত করে। কারণ তার প্রতিবেশী কী ভাবছে তা ভোটাররা জানতে চায় এবং তারাও একই লোককে ভোট দিতে পারে। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, জনমত জরিপ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে খুবই ক্ষুদ্রসংখ্যক মানুষের মতামত। যদি ভোটার নতুন কোনো তথ্য পান, তাহলে কীভাবে তাঁরা মত ও ভোট দেবেন তা কখনই জনমত জরিপে অনুমান করা যায় না। জনমত জরিপ প্রতিদিন প্রধান সংবাদ হিসেবে প্রকাশ হতে পারে না। কারণ এগুলো ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে।

মতামত জরিপ এখন একটি লাভজনক বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে। কখনও কখনও এটি প্রচারকাজের বর্ধিত রূপ হয়ে দেখা দেয়। রাজনীতিবিদরা এসব জরিপের মাধ্যমে জনগণের আবেগকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সংবাদ-

প্রতিষ্ঠানগুলোও অনেক সময় নির্বাচন জরিপ করে থাকে। সাংবাদিকরা শুধু পেশাদার গবেষণা – প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত জনমত জরিপগুলো নিয়ে রিপোর্ট করবে। এক্ষেত্রে একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠান জনমত জরিপ করে থাকে সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানতে হবে। ভালো জনমত জরিপ তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে জরিপটি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত জরিপ কি না, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রিপোর্টারের। এনবিসি নিউজের নির্বাচন রিপোর্টিং বিভাগের পরিচালক Sheldon R. Gawiser, Ph.D. এবং Princeton Survey Research Associates, Inc.-এর সভাপতি G. Evans Witt জনমত জরিপ কতটা নির্ভুল ও তথ্যবহুল তা যাচাইয়ের ওই জরিপের প্রতি সাংবাদিকের ২০টি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া উচিত। তাঁরা মনে করেন, এই ২০টি প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করার পরই সাংবাদিকদের উচিত জনমত জরিপ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা (Gawiser & Witt, 2000, p. 2)। প্রশ্নগুলো হলো :

১. কে/কারা জরিপটি করেছে?

যে-কোনো নির্বাচনী জরিপের জন্য এটিই প্রথম প্রশ্ন – কোন নির্বাচনী জরিপ সংস্থা, গবেষণা সংস্থা, রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য কোন গ্রুপ জরিপটি করেছে? যদি আপনি জানতে না পারেন কে বা কারা এ জরিপ করেছেন, তাহলে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আর কোনো দরকার নেই।

যদি জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থার নাম বলতে না পারেন, তাহলে এই জরিপ কোনোভাবেই গণমাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করা যাবে না, এ নিয়ে কোনো রিপোর্ট করা যাবে না। এমনকি তাদের গ্রহণযোগ্যতাও আর যাচাই করার দরকার নেই।

শুধু প্রতিষ্ঠিত বা খ্যাতিমান কোনো নির্বাচনী জরিপ সংস্থা প্রদত্ত তথ্যগুলোর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে দেখে রিপোর্ট করতে পারেন। কারণ একটি প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের জন্য খ্যাতি বা সুনাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি পেশাদার জরিপে ভুল বা ভ্রান্তি অনেক কম থাকে।

২. কে/কারা জরিপটির জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কেন করেছেন?

সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া একটি নির্বাচনী জনমত জরিপ করা হয় না। সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে জানতে হবে সে কারণ বা কারণগুলো কী কী এবং কারা এ জরিপের অর্থের জোগানদাতা। Gawiser এবং Witt (2000, p. 3) বলেছেন, *Polls are not conducted for the good of the world. They are conducted for a reason – either to gain helpful information or to advance a particular cause.* অর্থের জোগানদাতার খোঁজ পাওয়া গেলে এর পেছনে গূঢ় রহস্য জানা অনেকখানি সহজ হয়ে যায়।

৩. জরিপে কতজন মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে?

যে-কোনো জরিপে নমুনাসংখ্যা বেশি হলে সেখানে ভুলভ্রান্তি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে-কোনো বিজ্ঞানসম্মত জরিপে কতজন মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

৪. কীভাবে তাদেরকে সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই করা হয়েছে?

জরিপে জনমতের সত্যিকারের প্রতিফলন বেরিয়ে আসবে কি না, তা নির্ভর করে উত্তরদাতাদের কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে তার ওপর। যে-কোনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিশেষ করে দৈবচয়ন বা সম্ভাব্য নমুনায়নের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের বাছাই করা হয়। এ ধরনের পদ্ধতিতে বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, আয়, আবাসস্থল ইত্যাদি নানা চলকের ওপর নজর দিয়ে পুরো সমগ্রক বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংখ্যাকে বেছে নেয়া হয়। সে কারণে জনমতের ভালো প্রতিফলন বা চিত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. জরিপে কোন এলাকা, অঞ্চল, ধর্ম ও পেশার মানুষকে উত্তরদাতা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে?

বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তারকারী চলক যেমন, স্থান, পেশা, ধর্ম ইত্যাদি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সেজন্য জরিপে কী ধরনের উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে তার ওপরে জরিপের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব অনেকখানি নির্ভরশীল। যেমন, কোনো জরিপে যদি যাচ্ছেতাইভাবে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয় সেখানে অনিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা অনেক থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের মতামত দিয়ে আসন্ন নির্বাচন বিষয়ে কোনো অনুমান করলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

৬. নমুনাকৃত সকল মানুষের মতামতের ভিত্তিতে কি জরিপের ফলাফল টানা হয়েছে?

নির্বাচনী জরিপের ফলাফলকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার একটি সহজ উপায় হলো পুরো নমুনার ফলাফল তুলে না ধরে কোনো একটি উপদল বা গ্রুপের ফলাফল তুলে ধরা। এ বিষয়টি রিপোর্টারকে মাথায় রেখে জরিপের ফলাফল গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে চায়।

৭. কাদের সাক্ষাৎকার নেয়া উচিত ছিল এবং কেন নেয়া হয়নি?

কোনো জরিপেই সকল সমগ্রকের সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব নয়। এটা অবাস্তব। তবে প্রভাবশালী চলকগুলোর মধ্যে এমন কোনো গ্রুপের সাক্ষাৎকার বাদ পড়েছে কি না, তা একজন রিপোর্টার যাচাই করে দেখতে পারেন। যেমন, কোনো জরিপে নতুন ভোটার যাঁরা তাঁদের যদি নমুনা হিসেবে রাখা না হয়, তাহলে জরিপের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তবে অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেয়ার বিষয়ে জরিপ পরিচালনাকারীর নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। রিপোর্টারের উচিত সে ব্যাখ্যা জানা এবং তা গ্রহণযোগ্য কি না, তা যাচাই করা।

৮. কখন জরিপটি করা হয়েছে?

নির্বাচন একটি স্পর্শকাতর সময়। ভোটের আগে যে-কোনো একটি ঘটনা পুরো দৃশ্যপট পালটে দিতে পারে। সে কারণে জরিপটি কখন পরিচালনা করা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যেমন, কোনো দলের নেতার ভালো একটি বক্তৃতার পরদিনই একটি জরিপ করা হলে সে দলের প্রতি সমর্থন বাড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৯. কীভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে?

তিন উপায়ে এই ধরনের জরিপের জন্য সাক্ষাৎকার নেয়া যায় : সাক্ষাতে/সরাসরি, টেলিফোনে বা ইমেইলে। নির্বাচনী জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই টেলিফোনের ব্যবহার বেশি হয়। তবে আমাদের দেশে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই ধরনের জরিপ পরিচালনার প্রবণতা বেশি। সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি থাকে।

১০. জরিপটি কি ইন্টারনেট/অনলাইনে পরিচালিত হয়েছে?

নির্বাচনে জনমত যাচাইয়ের জন্য অনলাইনে পরিচালিত জরিপের ফলাফল যতই গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, তা নিয়ে সাংবাদিক রিপোর্ট করতে পারেন না। কারণ এখানে ক্লোজড বা বদ্ধ প্রশ্নই বেশি থাকে এবং এর উত্তরদাতাদের কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাছাই করা হয় না।

১১. জরিপের ফলাফলের ক্ষেত্রে নমুনা ত্রুটিগুলো কী?

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ১৬০০ থেকে ৩০০০ বয়স্ক মানুষের নমুনায়ন করলে তা ১৬ কোটি বাংলাদেশির মতের প্রতিফলন করতে পারে। কিন্তু নমুনায়নে ভুল বা অন্য কোনো পদ্ধতিগত ভুলের কারণে এই একই সংখ্যক নমুনার সাক্ষাৎকারের ভিন্ন ফল আসবে। যদিও জরিপটি সাদাচোখে ভুল নয়। এটিকে বলা হয় নমুনায়নের ভুল, এ ভুল যত কম হবে ফলাফলে ভুলের মাত্রা ততই কমে যাবে। মনে রাখতে হবে নমুনায়নের এ ত্রুটির সঙ্গে কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে, উত্তরদাতা উত্তর দিতে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জানাল কি না, কোথায় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, কীভাবে নেয়া হয়েছে ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। মানসম্মত জরিপ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নমুনায়নে কত শতাংশ ভুল বা ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা থাকে তা উল্লেখ করে।

১২. কে প্রথম হয়েছে?

অনেক নির্বাচনী জনমত জরিপে কোন দল বা কোন কোন প্রার্থী এগিয়ে আছে তা তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে রিপোর্টারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখতে হয়। নমুনায়নের ভুলের মাত্রা বা শতকরা হারটি এখানে রিপোর্টারকে বিবেচনা করতে হয়। বিশেষ করে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, কোনো জরিপে নমুনায়নের ভুলের হার যদি ৩ শতাংশ হয় এবং ওই জরিপে একজন প্রার্থী যদি আরেকজন প্রার্থীর চেয়ে এ হারের চেয়ে কম মার্জিনে এগিয়ে আছে, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী খুব বেশি এগিয়ে আছে তা বলা যাবে।

১৩. অন্য কোন অনুঘটকগুলো জরিপের ফলাফলকে ঘুরিয়ে দিতে পারে?

নমুনায়নের ভ্রান্তি জরিপের ভুল ফলাফলের একটি সম্ভাব্য কারণ। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যেগুলোর কারণে জরিপের ফলাফল ভিন্ন রকম হতে পারে বা ভুলের আশঙ্কা থেকে যায়। যেমন, কী ধরনের প্রশ্ন করা হলো, প্রশ্নের ক্রম কীভাবে সাজানো হয়েছে, সাক্ষাৎকারগ্রহীতাদের

পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকা, যথাযথ সুপারভিশন না থাকা, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা ইত্যাদি কারণেও জরিপের ফলাফলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১৪. কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে?

জরিপের প্রশ্নগুলো কী ধরনের শব্দচয়ন ছিল তা রিপোর্টারকে দেখতে হবে। প্রশ্নগুলো পক্ষপাতহীন ও নিরপেক্ষ ছিল কি না, তা যাচাই করতে হবে। উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ অপশন বা সুযোগ ছিল কি না, বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল কি না – এসব বিষয় রিপোর্টারকে যাচাই করে দেখতে হবে।

১৫. প্রশ্নের ধারাক্রম কেমন ছিল?

মাঝে মাঝে প্রশ্নের ধারাক্রম জরিপের ফলাফলে ভিন্নতা নিয়ে আসতে পারে। জটিল সমস্যাসংক্রান্ত প্রশ্নগুলো দিয়ে জরিপ শুরু হলে এবং জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের প্রশ্নগুলো আগে থাকলে ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন ধরুন, দেশে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা চলছে এবং জরিপের প্রশ্ন শুরু হয়েছে এ সমস্যা নিয়ে, শেষে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা কেমন তা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন রাখা হলে প্রথম দিকের প্রশ্নগুলোর প্রভাব শেষের দিকের প্রশ্নগুলোর ওপর পড়তে পারে।

১৬. 'পুশ পোল' সম্পর্কে কী করবেন?

পুশ পোল এমন জরিপ, যেখানে উত্তরদাতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলো হয় একপেশে ও পক্ষপাতমূলক। এ ধরনের জরিপ অনৈতিক। এ ধরনের জরিপ নিয়ে রিপোর্ট করা উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কোনো ইস্যু বা গুজব ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ ধরনের জরিপ করে থাকে।

১৭. একই ইস্যুতে অন্য জরিপগুলোতে কী বলছে?

নির্বাচনের সময় অনেক প্রতিষ্ঠান এমনকি সংবাদমাধ্যমগুলোও আলাদা আলাদা জনমত জরিপ করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে অন্যান্য জরিপগুলোতে কী বলছে তা যাচাই করে দেখতে পারে রিপোর্টার। যদি জরিপের ফলাফল ভিন্ন হয়, তাহলে প্রথম সাক্ষাৎকার নেয়ার সময়টা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জরিপগুলো হয়ে থাকে, তাহলে জনমতও ভিন্ন হতে পারে। যদি একই সময়ে হওয়া সত্ত্বেও ফলাফল ভিন্ন হয়, তাহলে জরিপ পরিচালনকারীদের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা জানতে চান। বিরোধপূর্ণ জনমত জরিপগুলো থেকে সব সময় ভালো কিছু সংবাদ তৈরি করা যায়।

১৮. সবগুলো প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে কি জরিপটি ঠিক আছে?

সাধারণত উত্তর হলো হ্যাঁ, জরিপটি ঠিক আছে। তবে জরিপ যতই ভালো বা খারাপ হোক না কেন, এই জরিপকে নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত জনমত বলে গণ্য করা যাবে। কারণ যে-কোনো ইস্যুতে যে-কোনো সময় জনমত ঘুরে যেতে পারে। সে কারণেই নির্বাচনী প্রচারে নামেন প্রার্থী ও দলগুলো।

১৯. সম্ভাব্য এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কি জরিপটি নিয়ে সংবাদ করা যায়?

হ্যাঁ, করা যাবে যদি কোনো খ্যাতিমান ও মানসম্পন্ন পেশাদার গবেষণা বা জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের হয়, তাহলে এসব ভুল সম্পর্কে ব্যাখ্যাসহ সংবাদ তৈরি করা যায়।

২০. এই জনমত দিয়ে কি ভালো রিপোর্ট করা যায়?

যদি জরিপটি ঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং জরিপে উল্লিখিত তথ্যগুলো যদি আপনি পান, তাহলে সংবাদমূল্যের বিচারে ও আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের সিদ্ধান্তের আলোকে অবশ্যই এই জরিপের ভিত্তিতে ভালো একটি রিপোর্ট আপনি করতে পারেন।

অধ্যায় ১৩

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সামাজিক গণমাধ্যম ও ফেক নিউজ

- যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নির্বাচনী কাভারেজ
- নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে আইসিটির ব্যবহার
- নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সামাজিক গণমাধ্যম
- ফেক বা ভুয়া নিউজ

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সামাজিক গণমাধ্যম ও ফেক নিউজ

যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নির্বাচনী কাভারেজ

বর্তমান যুগে যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া সাংবাদিকতা কল্পনাই করা যায় না। বিশ্বব্যাপী ১৯৫০ দশক থেকে কম্পিউটার সাংবাদিকতা ও গণযোযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে জনমত জরিপ ও নির্বাচনের কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় গণমাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যেত। বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী ছোট থেকে বড় যে-কোনো গণমাধ্যম কম্পিউটার ছাড়া কার্যত অচল। উৎপাদনে গতিশীলতা, বিশ্বব্যাপী দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং সৃষ্টিশীলতা বাড়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গণমাধ্যমের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে সাংবাদিকতায় যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব এত ব্যাপক যে, এজন্য এখন রিপোর্টিংকে বলা হয় কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিং বা কার (Computer-assisted reporting – CAR)। কম্পিউটার, সফটওয়ার এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন রিপোর্টার প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করে, সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি করে, সেসব তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়ারের সাহায্য নেয়, যোগাযোগের জন্য ইমেইল ও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে এবং পটভূমি গবেষণার জন্য ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ বা ওয়েব জগৎকে ব্যবহার করে। এসব কাজকে সমন্বিতভাবে বলা হয় কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিং। Justin Mayo ও Glenn Leshner-এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, *If the media in general act as a searchlight on society, then CAR gives the individual reporter a high-powered, hand-held flashlight.* (Mayo & Leshner, 2000)।

দ্রুততা, গতিশীলতা, তাৎক্ষণিকতা, কম খরচ ও বিশ্বব্যাপী তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আইসিটি সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ। সবচেয়ে বড় প্রভাবটি হলো আইসিটি বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাংবাদিকতার মান উন্নত হয়েছে। এত দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি কখনই তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। পাশাপাশি তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনেট বর্তমান যুগে একটি বড় হাতিয়ার। মাউসের এক ক্লিকে সাংবাদিকরা এখন পটভূমিমূলক তথ্য পেতে পারে, বিকল্প সূত্র ও ধারণা পায় কিংবা পায় পর্যাপ্ত তথ্য।

কম্পিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া এখন আমাদের দেশেও কোনো গণমাধ্যমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কম্পিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এখন কোনো রিপোর্টারের জন্য ফ্যাশন বা সাইডলাইনের কাজ নয়; বরং এ জ্ঞান একবিংশ শতাব্দীর যে-কোনো সাংবাদিকের অস্তিত্বের জন্য জরুরি। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যোগাযোগ

প্রযুক্তি রিপোর্টার বা ভালো রিপোর্টার জন্ম দেয় না; বরং একজন ভালো রিপোর্টারকে আরও ভালো করে তোলে, তার কাজকে শানিত করে।

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে আইসিটির ব্যবহার

বিশ্বব্যাপী বর্তমান যুগে নির্বাচন কাভারেজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য অবারিত সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে আইসিটি। এখন প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনে কাভারেজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিত্যনতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এমন কোনো সংবাদকক্ষ পাওয়া যাবে না, যেখানে আইসিটি ছাড়া নির্বাচন কাভারেজের কোনো পরিকল্পনা হয়। যে-কোনো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে অর্থাৎ প্রস্তুতি নেয়ার সময় একটি ডাটাব্যাংক গড়ে তুলতে হয়। যেমন, বিগত নির্বাচনগুলোর পরিসংখ্যান, নির্বাচনী আইন, রাজনৈতিক দলগুলোর অতীত ইশতেহার ইত্যাদি বিষয়ে একটি শক্তিশালী ডাটাব্যাংক বা ডিজিটাল আর্কাইভ থাকলে পুরো নির্বাচনের সময় রেফারেন্সের জন্য সাংবাদিকদের ছুটোছুটি করতে হয় না।

নির্বাচন কাভারেজের যেসব ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার হয়ে থাকে :

১. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য

২. সূত্রের সন্ধান করতে

৩. নতুন ও প্রচলিত যে-কোনো গণমাধ্যমের জন্য আধেয় তৈরিতে

৪. সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা পাঠক-দর্শকের মধ্যে সংবাদ সরবরাহ করতে

৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরিবর্তন ও নতুন নতুন সুযোগগুলো কাজে লাগাতে

৬. মতামত জরিপ করতে

৭. অনলাইনে সাক্ষাৎকার নিতে

৮. তথ্য সংরক্ষণে

৯. পরিসংখ্যান প্রক্রিয়াজাতকরণ

১০. পাঠক/দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সামাজিক গণমাধ্যম

বর্তমান সময়ে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য সামাজিক গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাথমিক সতর্কতার সূচক, ব্রেকিং নিউজের উৎস, তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যম, গুজব-রটনাকারী, গণবিতর্কের স্থল, জনমত বিনিময়ের সভাস্থল ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এখন বহুমুখী ও বহুরূপী। এ কারণে প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমগুলো নির্বাচনের সময় সামাজিক গণমাধ্যমকে অবহেলা করতে পারে না। বরং ভালো নির্বাচনী প্রচার কাভারেজের জন্য সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে পরিকল্পনা সাজাতে হয়।

অনেক সংবাদই এখন মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার আগেই চলে আসে সামাজিক গণমাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, সংগীতশিল্পী মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু, ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলা, ২০১১ সালে জাপানে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এসব খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে আগে প্রচারিত হয়েছে। শুধু তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে নয়, সূত্রের ব্যাপক অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনেও এ মাধ্যমের জুড়ি মেলা ভার।

বড় ও প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমগুলো একজন সামাজিক গণমাধ্যম সম্পাদক ও সামাজিক গণমাধ্যম রিপোর্টারদের নিয়োগ দেয়। তারা সামাজিক গণমাধ্যম বিষয়ে একটি টিম গঠন করে থাকে। এ টিমের সদস্যরা সবগুলো ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করে সেখান থেকে দরকারি তথ্য, ছবি, ভিডিও, অডিও সংগ্রহ করেন এবং তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে তা যথাযথ সূত্রের উল্লেখ করে প্রচার করেন।

সামাজিক গণমাধ্যম টিমের সদস্যদের তথ্য বের করা এবং সে তথ্যগুলো যাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। প্রার্থী ও দলের নিজস্ব সামাজিক গণমাধ্যম অ্যাকাউন্ট (যেমন – টুইটার, ফেসবুক) নিয়মিত তদারক করতে হয়। কারণ এগুলো প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর ডিসকোর্সগুলো ব্যাখ্যা করা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও দলের ডিসকোর্সের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা এবং সামাজিক গণমাধ্যমে প্রার্থী ও দলের জনপ্রিয়তার হ্রাস-বৃদ্ধি যাচাই করতে হয়।

সামাজিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত নিয়মিত অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট করা

- সাড়া জাগানো বিষয় (buzzes) ও প্রবণতাগুলো তুলে ধরা
- রাজনৈতিক প্রার্থীদের প্রতি সমর্থনগুলো খতিয়ে দেখা
- বিভিন্ন বিষয় ও নীতির প্রতি সমর্থনগুলো যাচাই করা
- একজন প্রার্থীর প্রকৃত সংযোগ ও মতামত তুলে ধরে এমন বিষয়গুলোর ব্যবচ্ছেদ করা
- জনপ্রিয় রিটুইটগুলোর আধেয় ব্যাখ্যা করা।

তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সামাজিক গণমাধ্যম একদিকে যেমন সংবাদের হাতিয়ার তেমনি এটি গুজব, মিথ্যা ও হিংসার উৎস। তথ্যের উৎস হিসেবে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না তেমনি এটি সাংবাদিকতায় ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে। টুইটার গবেষক Hermida (2012, p. 1) মনে করেন, *The development of social networks for real-time news and information, and the integration of social media content in the news media, creates tensions for a profession based on a discipline of verification.*

সামাজিক গণমাধ্যম থেকে পাওয়া মন্তব্যগুলো আলাদাভাবে ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে যাচাই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সামাজিক গণমাধ্যমে পাওয়া মন্তব্যগুলো কোনো বৈজ্ঞানিক জরিপের ফল নয়। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সামাজিক গণমাধ্যমের কোনো অনুমানকে

বিশ্বাস করা যাবে না। তবে এগুলো থেকে মজাদার কিছু ইঙ্গিত, সতর্কতা, মন্তব্য, প্রোফাইল, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি জানা যেতে পারে। মূলধারার গণমাধ্যমগুলো সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে গিয়ে প্রচলিত যেসব নৈতিকতার মানদণ্ড অনুসরণ করে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদেরকে সেসব নীতি অনুসরণ করতে হয়। সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারিত মতকে সব স্তরের মানুষের মত বলে ভুল করা যাবে না। কারণ মনে রাখতে হবে, দেশের অনেক মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন না। সামাজিক গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই তা অন্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে যাচাই করে প্রকাশ করতে হবে।

- **সততা :** আপনার পেশাদারিত্বের সততার সঙ্গে কখনই আপস করবেন না।
- **সূত্র :** সাংবাদিককে অবশ্যই সর্বদা তথ্যের উৎস যাচাই করতে হবে।
- **নির্ভুলতা :** প্রকাশিত তথ্য অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।
- **আপনার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড :** আপনার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটার অ্যাকাউন্টসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা-কিছু প্রকাশ করুন না কেন, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ আপনি আপনার গণমাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সে কারণে যা পোস্ট দিচ্ছেন সে সম্পর্কে ভাবুন।
- **মতামত :** এটি পরিষ্কার করুন যে, আপনি যে মতামত দিচ্ছেন তা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত এবং কোনোভাবেই এটি আপনার প্রতিষ্ঠানের মত নয়। European Broadcasting Union বলেছে, *Journalists must clearly distinguish between their private postings on social media (blogs, tweets etc) and what they write in their professional capacity.* (Berg & Betcheva, 2014, p. 18)।
- **রাজনৈতিক অবস্থান :** আপনার রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে এমন কোনো ধারণা দেবেন না, যাতে আপনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
- **ব্রেকিং নিউজ :** আপনার নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইটে কোনো ব্রেকিং নিউজ দেয়ার আগে তা আপনার প্রতিষ্ঠানের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না, তা যাচাই করুন।

ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ

আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম পাঁচ ধরনের ভূমিকা পালন করে (McNair, 2007, pp. 19-20)। সেগুলো হলো : ১) চারপাশের ঘটনা নিয়ে জনগণকে তথ্য জানানো; ২) এসব ঘটনা ও তথ্যের গুরুত্ব এবং অর্থ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করা; ৩) জনমত গঠন ত্বরান্বিত করতে জনপরিসরে উন্মুক্ত রাজনৈতিক আলোচনার প্ল্যাটফরম বা ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা; ৪) সাংবাদিকতার প্রহরীর ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে

সরকারি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা; এবং ৫) রাজনৈতিক মতাদর্শের অ্যাডভোকেসির চ্যানেল হিসেবে কাজ করা। গণমাধ্যমের এই ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার জন্য যাচাই-বাছাইকৃত সত্য, নির্ভুল এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংবাদে উপস্থাপন করতে হয় যেখানে থাকবে না সাংবাদিকের নিজস্ব কোনো মতামত। বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিবিসির রাজনৈতিক সম্পাদক এন্ড্রু মার, *When I joined the BBC, my Organs of Opinion were formally removed.* (The Editor, 2017)। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের বিপরীতে ভুল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরিবেশিত সংবাদকে বলা হয় ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া বা মিথ্যা সংবাদ এখন বিশ্বব্যাপী একটি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারে ফেক নিউজ

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ফেক নিউজ শব্দবন্ধ জনপ্রিয়তা পায়। এই নির্বাচনে ফেক নিউজের ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে, *ওয়াশিংটন পোস্ট* তাদের একটি সংবাদের শুরু করে এভাবে, *It's official: Truth is dead. Facts are passe.* (Wang, 2016)। ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারির বিবেচনায় সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ছিল ফেক নিউজ। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কল্যাণে শব্দটি আলোচিত শব্দাবলির তালিকায় ছিল। ট্রাম্প সিএনএনের প্রতিবেদক জিম অ্যাকোস্টোকে বলেছিলেন 'আপনি ফেক নিউজ'। এরপর টুইটারে তিনি প্রায়ই এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন এবং কিছুদিন পর 'ফেক নিউজ অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন। ২০১৭ সালে জার্মান নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল ফেক নিউজ।

মার্কিন নির্বাচনে ফেক নিউজ শব্দবন্ধ ব্যাপক পরিচিতি পেলেও এটি নতুন কিছু নয়। ১৮০৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন অভিযোগ করেছিলেন, 'সংবাদপত্র যিনি পড়েন তাঁর চেয়ে সংবাদপত্র যিনি পড়েন না তিনি কোনো ঘটনা সম্পর্কে অনেক ভালো তথ্য জানেন' (Uberti, 2016)। ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর বলতে বোঝানো হয় পুরো মিথ্যা তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা সংবাদ। এটির প্রচলন আগেও ছিল। যেটি নতুন এবং পরিবর্তন হয়েছে সেটি হলো কীভাবে মানুষ ভুয়া সংবাদকে গ্রহণ করছে এবং সংজ্ঞায়িত করছে। আগে প্রচলিত গণমাধ্যমের সাহায্যে ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হতো, এখন অনলাইন ও সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে বেশি ছড়ানো হচ্ছে। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এর প্রভাব ও ভয়বহতাও আগের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ ইন্টারনেটের প্রসার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচলনই ভুয়া সংবাদকে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আর এতে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

চরিত্র হনন, ব্র্যান্ডিং, জনসংযোগ, নিউজ ম্যানেজমেন্ট, প্রচারণা বা মিথ্যা প্রচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এসবই নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনের সময় ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদের লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা আর উপলক্ষ্য হয় চরিত্র হনন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজন ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করা হলো

চরিত্রহনন। এর মাধ্যমে ব্যক্তির জন্ম, পারিবারিক পরিচিতি, সাফল্য সবকিছু প্রশ্নবিদ্ধ করতে দেখা যায়।

অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাধারণ ভোটার, বিশেষ করে তরুণ এবং সহস্রাব্দ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে এক অভূতপূর্ব মাধ্যম, এটি রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলের চিন্তকেরা বুঝতে পেরেছেন। ফলে দলের নেতৃত্বের ভাবমূর্তি গড়ায় এই মাধ্যমে তাঁরা নজর দিয়েছেন। ট্রাম্পের আগে এই সুবিধা পেয়ে আলোচিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগেই টুইটারে সর্বাধিকসংখ্যক অনুসারী ছিল তার, ফেসবুক ও টুইটারে তাঁর অনুসারী প্রায় ১০ কোটি।

২০১৪ সালের ভারতের নির্বাচনের সময়ে ওই বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১২ মে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ৫ কোটি ৬০ লাখ টুইট ছিল নির্বাচনবিষয়ক। ওই চার মাসে মোদির অনুসারী ২৮ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৪০ লাখে পৌঁছায়। ভুয়া অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করতে সক্ষম এক সফটওয়্যারের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান সোশ্যালবেকারস তখন জানান যে তাঁর সমর্থকদের অর্ধেকই সন্দেহজনক। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিভিন্ন দেশের সরকারকে ডিজিটাল কৌশল নির্ধারণে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান টুইপলোমেসি (Twiplomacy) তাদের এক রিপোর্টে দেখায় যে, মোদির ৪০,৯৯৩,০৫৩ অনুসারীর মধ্যে ২৪,৭৯৯,৫২৭ অনুসারী ভুয়া (The New Indian Express, 2018)। অর্থাৎ মোদির অনুসারী মধ্যে ৬০ শতাংশই ভুয়া বা বানোয়াট। একই রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ৪৮,৯৩৯,৯৪৮ জন অনুসারীর মধ্যে ১২,৪৪৫,৬০৪ জনই ফেক বা ভুয়া।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ফেক বা ভুয়া নিউজের ছড়াছড়ি এবং এসব নিউজ প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ফেক বা ভুয়া নিউজের প্রভাব না থাকলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। *নিউইয়র্ক* ম্যাগাজিনের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ম্যাক্স রিডের একটি লেখার শিরোনাম হলো, *Donald Trump Won Because of Facebook* (Read, 2016)। *গার্ডিয়ান*-এর রাজনৈতিক বিশ্লেষক পারকিনসনের লেখার শিরোনাম ছিল, *Click and elect: how fake news helped Donald Trump win a real election* (Parkinson, 2016)।

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ছড়ানো কিছু মিথ্যা খবর নির্বাচনের দিন ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের বহু সমর্থককে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল (Blake, 2018)। গবেষণাটির তথ্য অনুসারে, ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সমর্থক থাকা প্রায় ৪ শতাংশ ভোটার মিথ্যা সংবাদ বিশ্বাস করে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারির ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন। রিচার্ড গাস্থার, পল এ. বেক এবং এরিক সি. নিসবেট নামের তিন গবেষণাকারী তাঁদের গবেষণার জন্য ২০১৬-এর নির্বাচনী প্রচার চলাকালে সাড়া ফেলে দেয়া তিনটি ভুয়া খবর বেছে নেন। 'ইউগভ' নামের ওই গবেষণায় ৫৮৫ জন ওবামা-সমর্থকের ওপর জরিপটি চালানো হয়, যাঁদের ২৩ শতাংশ হিলারিকে ভোট দেননি। ওবামা সমর্থকরা যে তিনটি সংবাদকে 'সম্ভবত সত্য' হিসেবে

বিশ্বাস করেছিলেন সেগুলো এরকম :

- হিলারি জটিল রোগের কারণে গুরুতর অসুস্থ (১২ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)
- পোপ ফ্রান্সিস ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন (৮ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)
- হিলারি বিভিন্ন ইসলামি চরমপন্থি ও জঙ্গি সংগঠন, এমনকি আইএসের কাছেও অস্ত্র বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন (২০ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)।

সার্বিকভাবে ওবামার সমর্থকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই তিনটির অন্তত একটি সংবাদ বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসীদের ৪৫ শতাংশ হিলারির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ভুয়া খবরে বিশ্বাস না করা ভোটারদের ৮৯ শতাংশই ভোট দিয়েছিলেন হিলারিকে।

২০১৬ সালের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট্ট শহর ভেলেস থেকেই শুধু শ-খানেক সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট প্রকাশিত হতো, যেগুলোর কাজ ছিল ট্রাম্পপন্থি ফেক নিউজ প্রচার করা। এই নির্বাচনে ১৪০টি ভুয়া নিউজের ওয়েবসাইট খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (CNBC, 2016)। ফেক নিউজের ওয়েবসাইটগুলোর দৌরাত্ম্য এত বেশি ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে গুগলের সার্চে প্রথমেই দেখা গিয়েছিল এদের সংবাদ (Earl, 2016)। যেমন, এমন একটি সংবাদ ছিল ট্রাম্প পপুলার ভোট ও ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে জিতেছেন। অথচ হিলারি পপুলার ভোটে এগিয়ে ছিলেন।

ভুয়া নিউজ কীভাবে ছড়ায় সে বিষয়ে জার্মানির একটি উদাহরণ টেনেছেন জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের বাংলা রেডিও (DW, 2017)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্রাইটবার্ট.কম' জার্মানির ডর্টমুন্ড শহরে হাজার হাজার মানুষের নববর্ষ উদ্‌যাপনের খবরের শিরোনাম করে, 'নিউ ইয়ার্স ইভে ১,০০০ মানুষের দঙ্গল পুলিশকে আক্রমণ করেছে ও জার্মানির প্রাচীনতম গির্জায় আগুন ধরিয়েছে।' ব্রাইটবার্ট ডর্টমুন্ডের ঘটনার 'অল্ট-রাইট' সংস্করণ প্রকাশের পর, প্রথম জার্মান ভাষাভাষী পত্রিকা হিসেবে অস্ট্রিয়ার *ভোখেনব্লিক* পত্রিকা ব্রাইটবার্টের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *ভোখেনব্লিক*-এর শিরোনাম ছিল, 'ডর্টমুন্ডে নিউ ইয়ার্স ইভ : আল্লাহু আকবর ও গির্জায় আগুন'। সামাজিক গণমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এ সংবাদটি পুরোটাই ছিল বানোয়াট।

বাংলাদেশে ফেক নিউজ

বিটিআরসির এক হিসাব অনুযায়ী, ৮৬.৭২ শতাংশ মানুষ বাংলাদেশে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যারা প্রধান ভুয়া বা মিথ্যা সংবাদ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে দাঙ্গা বা সংঘর্ষ বাধিয়ে থাকে (Alam, 2018)।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা অস্ট্রেলিয়া যান ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর রাতে। পরের দিন দৈনিক *প্রথম আলোর* এ বিষয়ে সংবাদের শিরোনাম ছিল–"'আমি বিব্রত', বিদেশ যাওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি"। এটা প্রধান শিরোনাম ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলামের শীর্ষ খবরটি ছাপা হয়। কিন্তু *প্রথম আলোর* নামে যে খবরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়, তার শিরোনাম হলো, 'সরকারের চাপের মুখে প্রধান

বিচারপতির দেশত্যাগ'। *প্রথম আলোর* মাস্টহেড ব্যবহার করে কম্পিউটারে মেকআপ করে প্রতারকরা ওই শিরোনাম প্রধান শিরোনাম করে তার স্ক্রিনশট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এ নিয়ে *প্রথম আলো* একটি প্রতিবেদনও ছাপে, যার শিরোনাম 'এটা ভুয়া খবর'। সেখানে ভুয়া এবং সঠিক পত্রিকার ছবিও দেয়া হয় (DW, 2017)।

একইভাবে আরও দুটি জাতীয় দৈনিকের নামে ফেসবুকে মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়। এর মধ্যে একটি হলো ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* অন্যটি *সমকাল*। *ডেইলি স্টার* 'It's fake' নামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। পত্রিকাটির সম্পাদক মাহফুজ আনামের নাম দিয়ে মিথ্যা কলাম প্রকাশের খবর প্রচার হয় ফেসবুকের পোস্টে।

২০১৭ সালের ৩ নভেম্বর ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* তাদের শুক্রবারের ম্যাগাজিন স্টার উইকএন্ডে একটি লেখা প্রকাশ করে, যার শিরোনাম- "'সুবোধ' আর্টিস্ট অ্যারেস্টেড"। শিরোনামের ওপরে ছোট হরফে লেখা ছিল – 'স্যাটায়ার'। রম্য লেখাটির মূল বিষয়বস্তু হলো তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা। ওই আইন নিয়ে স্যাটায়ার করতে গিয়েই লেখক 'সুবোধ'-এর আশ্রয় নিয়েছিলেন (bdnews24.com, 2017)। কিন্তু সেই রম্য লেখাকেই সত্য ধরে নিয়ে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের অনলাইন সংস্করণে ওইদিন বিকেলবেলায় শীর্ষ খবর প্রচারিত হয়, 'সুবোধ গ্রাফিতির শিল্পীসহ গ্রেফতার ৩'।

শুধু দেশেই নয়, এ ধরনের ভুয়া খবরগুলো ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশের নিউজ পোর্টালগুলোতে। যেমন, সুবোধসংক্রান্ত এ সংবাদটি শিরোনাম করে কলকাতার একটি অনলাইনে শিরোনাম হয়।

ফেক নিউজ কারা ও কীভাবে করে?

ফেক বা ভুয়া নিউজগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আসে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ ধরনের মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচারের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। যেমন, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচারের জন্য তৈরি হয় denverguardian.com নামক ওয়েবসাইটটি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে এই ওয়েবসাইটে 'FBI Agent Suspected In Hillary Email Leaks Found Dead In Apparent Murder-Suicide' শিরোনামে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা খবর প্রচার করে। ৫ লাখ লোক এই খবরটি শেয়ার করে এবং দেড় কোটিরও বেশি মানুষ এই খবরটি পড়েছে। এই ওয়েবসাইটের মালিক জেস্টিন কোলার রাতারাতি বনে যান 'ফেক নিউজের রাজা'। এ ধরনের ভুয়া নিউজের ওয়েবসাইটগুলো প্রতিষ্ঠিত বা নামিদামি সংবাদপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের সঙ্গে মিল রেখে নিজেদের নাম রাখে। যেমন, একটি ফেক নিউজ সাইট হলো washingtonpost.com.co (আসল নিউজ সাইট হলো washingtonpost.com)। নিজেদের যোগাযোগের ঠিকানাও দেয় নামিদামি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে। যেমন, denverguardian.com সাইটটির ঠিকানা দেয়া ছিল বিশ্ববিখ্যাত *গার্ডিয়ান* পত্রিকার পার্কিং লট। বাংলাদেশেও সম্প্রতি আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এমন বেশ কিছু ওয়েবসাইট তৈরির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্বনামধন্য গণমাধ্যমের নামে ভুয়া সাইট তৈরি হওয়ায় গণমাধ্যমগুলো থানায় সাধারণ ডায়ারিও করেছে।

ওপরের ভুয়া ও ওয়েবসাইটটিতে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর ঠিকানা হলো www.prothomaalo.com। অথচ আসল *প্রথম আলোর* ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো https://www.prothomalo.com/। এমনই একটি ভুয়া ওয়েবসাইট করা হয়েছে দৈনিক *যুগান্তর*-এর নামেও। বিবিসি নিউজ বাংলার ওয়েবসাইট হলো bbcbangla.com বা https://www.bbc.com/bengali; কিন্তু ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে bbc-bangla.com নামে।

বিবিসি বাংলার নামে ফেইক ওয়েবসাইট। বিবিসির একজন সাংবাদিক চিহ্নিত করেছেন এটা ভুয়া ওয়েবসাইট।

যুগান্তরের লোগো ব্যবহার করে যুগান্তর নিউজ (jugantornews.com) নামে ভুয়া ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণা করছে একটি চক্র। ওয়েবসাইটটি দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আবার কিছু ওয়েবসাইট থেকে স্যাটায়ার বা রম্য ধরনের। এগুলোতে প্রকাশিত কোনো কৌতুক বা রম্য আর্টিকেলকে অন্য একটি সাইটে খবর হিসেবে প্রচার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে wtoe5news.com নামক একটি ওয়েবসাইট এ ধরনের খবর প্রচার করত। গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনের সময় দুটি উদ্দেশ্যে মূলত এ ধরনের ফেক নিউজের ওয়েবসাইট চালু করা হয়। প্রথমত, এ ধরনের ফেক নিউজের মাধ্যমে প্রচুর আয় হয়। অনলাইনে ক্লিকের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনের অর্থ আসে। সে কারণে নির্বাচনের সময় এ ধরনের ফেক নিউজ যত বেশি শেয়ার ও পড়া হয় তত বেশি অর্থ আয় হয়। দ্বিতীয় কারণটি আদর্শগত। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কোনো দল বা প্রার্থী এ ধরনের ফেক নিউজ ওয়েবসাইট করে থাকে।

ফেক নিউজ অ্যাপ

শুধু ফেক নিউজ ওয়েবসাইট কিংবা সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে ফেক নিউজ রটিয়ে দেয়ার কাজটিই হচ্ছে না, খুব সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের লোগো নকল করে ফেক নিউজ অ্যাপ তৈরি করে পাঠক ও দর্শককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এ রকম একটি ফেক নিউজ অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে বিবিসি বাংলার নামে।

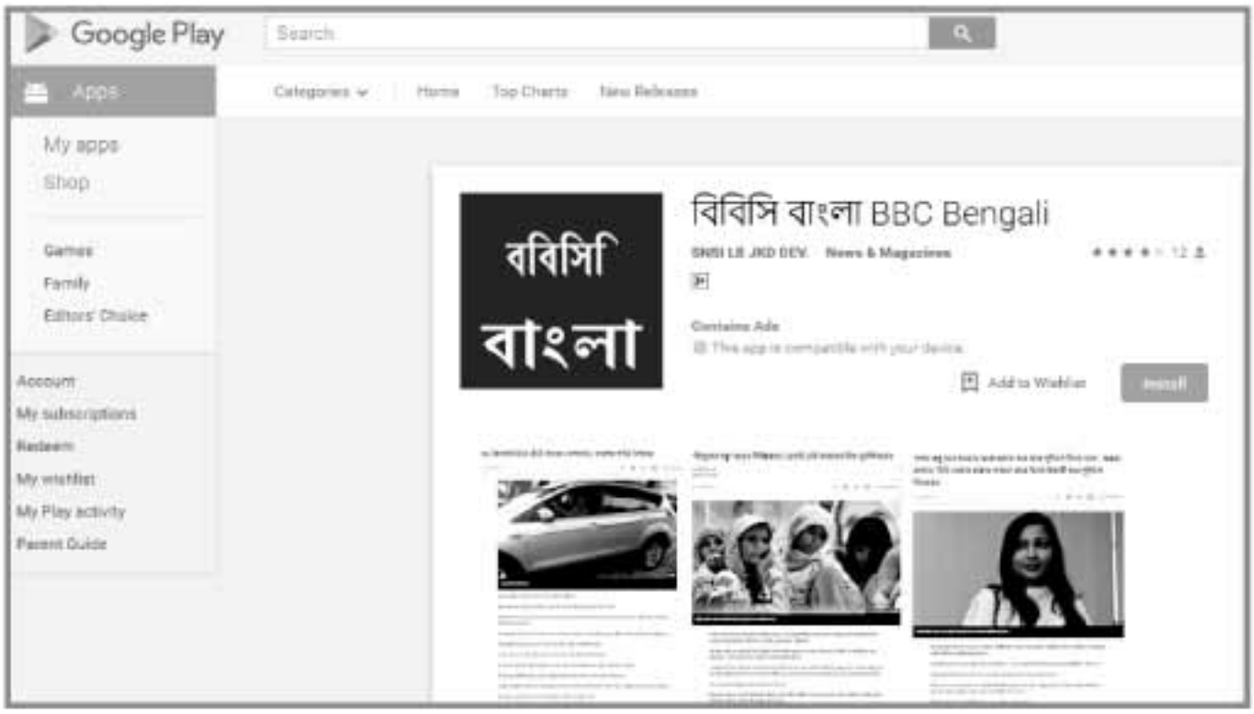

ফেক নিউজ প্রতিরোধে করণীয়

সামাজিক গণমাধ্যমকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাংবাদিকদের বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। যে লিংক থেকে আপনি তথ্যটি ব্যবহার করছেন তা মূল লিংক কি না, তা যাচাই করতে হবে। যদি মূল লিংক না হয়, তাহলে মূল লিংকে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা দেখতে হবে। সামাজিক গণমাধ্যমকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনাকে প্রথমেই করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে লিংক

থেকে আপনি সংবাদ করছেন সেখানে যা বলা আছে মূল বা প্রাথমিক লিংকে তার চেয়ে ভিন্ন কিছু বা উলটো কথা বলা আছে। তখন এই মূল রিপোর্ট আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনি নিজে দেখেননি বা শোনেননি এমন কোনো ভিডিও বা অডিওর কথা রিপোর্টে তুলে ধরবেন না।

সামাজিক গণমাধ্যমকে তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করার জন্য অ্যাকাউন্টের সত্যতা যাচাই করা জরুরি। যখন কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো তথ্য ব্যবহার করতে চান, তার আগে সে অ্যাকাউন্টের সত্যতা যাচাই করতে হবে। গুগলের মাধ্যমে খোঁজ করুন, সে অ্যাকাউন্ট বা তথ্যের সূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করুন। অন্য কোনো গণমাধ্যম ওই অ্যাকাউন্ট বা ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে বলেই আপনি নিশ্চিত তথ্যটি প্রচার করবেন না। নিজেই যাচাই করুন। অনেক সময় ওই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতির কারণে ভুল বা অর্ধসত্য তথ্য প্রচার করতে পারে। নির্বাচনী প্রচারের সময় সামাজিক গণমাধ্যম থেকে তথ্য নিয়ে তা প্রচারের ক্ষেত্রে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ও ফেক নিউজ চিহ্নিত করার জন্য সাংবাদিকরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারে :

১. অ্যাকাউন্ট/ওয়েবসাইটের বৃত্তান্ত দেখুন

টুইটার বা ফেসবুকের অ্যাকাউন্টে বৃত্তান্ত দেখুন। যদি সেখানে কোনো নাম না থাকে, তাহলে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। সন্দেহজনক ইউআরএল বা ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেখলে মূল ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।

২. ICANN –এর সাইটে গিয়ে চেক করুন

সারা বিশ্বে ওয়েবসাইটের ঠিকানার বিষয়াদি যাচাই করার জন্য স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হলো আইক্যান (ICANN)। কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে আইক্যানের (https://whois.icann.org/en) অনুসন্ধান পাতায় গিয়ে ওই ওয়েবসাইটের ঠিকানা লিখে সার্চ দিলে ওয়েবসাইটটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন। যেমন, ওয়েবসাইটটি কবে তৈরি করা হয়েছে, কোথায় এর ঠিকানা ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য আইক্যানের মাধ্যমে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে।

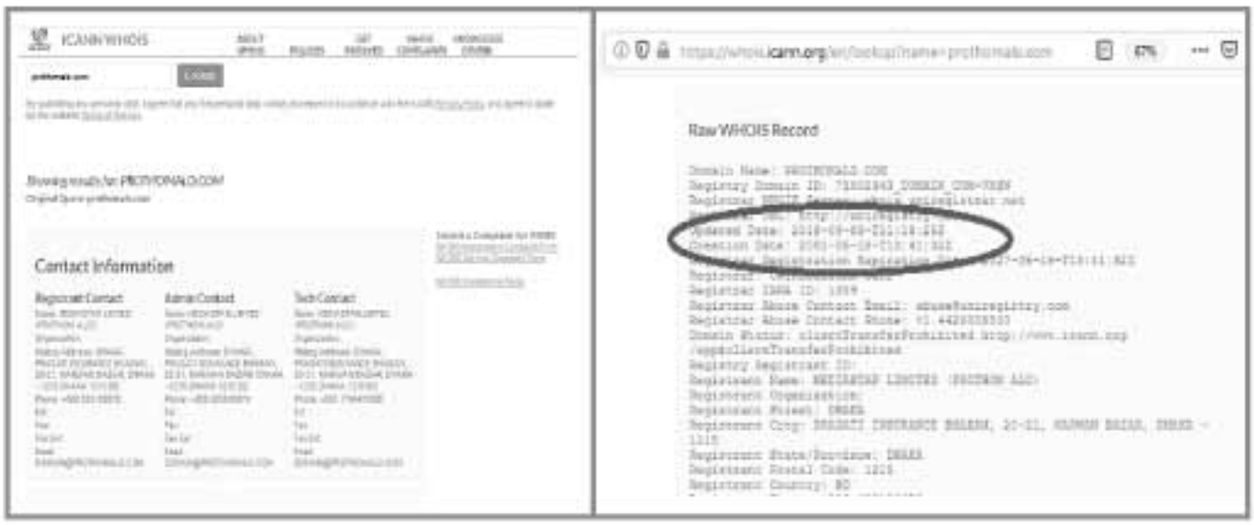

৩. পোস্টের স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন

বৃত্তান্তে ও পোস্টে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে তথ্য যাচাই করুন। মনে করুন, কেউ তার বসবাসের স্থান দিয়েছেন চট্টগ্রামে, অথচ তার প্রচারিত ভিডিওটি খুলনায়। সেক্ষেত্রে এ ভিডিওটিকে অবশ্যই সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

৪. খবরের সূত্র খেয়াল করুন

যে সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি প্রচার করছে তা যাচাই করে দেখুন। দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির নাম-পরিচয় দিয়ে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না ভেবে দেখুন। ভুয়া তথ্য যাচাই করতে গুগলের কাস্টম সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করুন।

৫. অ্যাকাউন্টধারীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানা

সংক্ষিপ্ত নামে অ্যাকাউন্ট খোলা যে-কোনো ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার চেষ্টা করুন।

৬. শিরোনাম নিয়ে সন্দিহান হতে হবে

ভুয়া খবরের শিরোনামগুলো হয়ে থাকে চটকদারি। এগুলোর শেষে দাঁড়ির বদলে একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকে।

৭. ব্রেকিং নিউজ সম্পর্কে সাবধান

'ব্রেকিং নিউজ' বলে প্রচার করছে এমন কোনো খবরের ক্ষেত্রে প্রচারকারী ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করুন। কারণ সাংবাদিকতার এ ধরনের শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি আদৌ সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত না হলে তার উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে।

৮. অজানা অ্যাকাউন্ট/বেনামি সূত্রের তথ্য সম্পর্কে সচেতন হোন

আপনি জানেন না, এমন কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো তথ্য প্রচার করতে হলে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে। অজানা কোনো সূত্রের বরাত দিয়ে তুলে ধরা নিউজকে বিশ্বাস করবেন না। এক্ষেত্রে অন্য কোনো গণমাধ্যমে এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে কি না যাচাই করে দেখুন।

৯. বানান ও কাঠামো খেয়াল করুন

ভুয়া নিউজ ওয়েবসাইটগুলোতে প্রচুর বানান ভুল থাকে। এদের লাইন ও অনুচ্ছেদের কাঠামোতেও অসংলগ্নতা থাকে।

১০. দিনক্ষণ যাচাই করুন

ভুয়া খবরগুলোতে দিনক্ষণে প্রচুর অসংলগ্নতা থাকে। দেখা যাবে শুরুতে একটি তারিখের উল্লেখ থাকলে পরে অন্য একটি দিনের কথা বলা আছে। উল্লিখিত দিনটি সরকারি ছুটির দিন কি না যাচাই করে দেখুন।

১১. খবরটি কি কৌতুক

খবর বা ওয়েবসাইট কি কৌতুক বা স্যাটায়ার কি না, তা যাচাই করে দেখুন। যে সূত্রে খবর দেয়া হচ্ছে সেটি এই ধরনের কৌতুকপূর্ণ খবর ছড়ায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখুন।

১২. ছবি লক্ষ্য করুন

খবর বা পোস্টে ব্যবহৃত ছবিগুলো ভালোভাবে খেয়াল করুন। ছবিতে অনেক কারসাজি থাকতে পারে। ছবির সত্যতা যাচাই করতে গুগল ইমেজে ফটো চেকিং টুলগুলো ব্যবহার করুন।

সামাজিক গণমাধ্যমে ভুল সংশোধন

যদি আপনি অনলাইনে কোনো ভুল তথ্য দেন, তাহলে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত সংশোধন করুন। অনলাইনে তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভুল, তথ্য টুইটারে দিলে তা সংশোধিত তথ্যের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ টুইটারে কোনো সংশোধন টুল নেই। এক্ষেত্রে টুইটারে কোনো ভুল তথ্য দিলে তার জন্য বেশি পরিশ্রম করতে হয়। একদিকে নতুন সংশোধনী তথ্য টুইট করতে হয়। কিছু অনলাইন সাইট আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি দেখতে পারেন কারা আপনার ভুল তথ্য পুনরায় টুইট করছে। যেমন, Tweetreach, Tweet Binder বা WhoTweetedMe.com। তাদেরকে দ্রুত সংশোধনী সম্পর্কে জানাতে হবে। একই সঙ্গে শুধু সামাজিক গণমাধ্যমে নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আপনি ভুল তথ্যটি দিয়েছেন সবখানে তা ঠিক করতে হবে।

অধ্যায় ১৪

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচনে জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিং

- জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিংয়ের জন্য করণীয়
- প্রতিবন্ধী ও তরুণদের নিয়ে রিপোর্টিং

নির্বাচনে জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিং

জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের যে সামাজিক বৈষম্য গড়ে তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আর জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিং বা সাংবাদিকতা হলো এই বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে এমন সাংবাদিকতা। জেন্ডার সংবেদনশীল নির্বাচনী রিপোর্টিং বলতে বোঝায় :

- জেন্ডারের ভূমিকা, পক্ষপাতিত্ব ও কুসংস্কারগুলো সম্পর্কিত বোঝাপড়ার প্রতিফলন;
- নারী ও পুরুষের সমান ও নিরপেক্ষ কাভারেজকে উৎসাহিত করা;
- নির্বাচনে নারী ও পুরুষের অবাধ ও সমান অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করা; এবং
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার খবর তুলে ধরা।

নির্বাচনী কাভারেজের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিংয়ের লক্ষ্য হলো জাতীয় ইস্যু বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ উভয়ের পূর্ণ মাত্রায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাগুলো চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও চাহিদাগুলোকে একীভূত করে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা। জেন্ডার মূলধারাকরণের উদ্দেশ্য কার্যত লিঙ্গসমতায় রূপ নেয়। যে-কোনো আদর্শ সাংবাদিকতার নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়ে সংবাদের বিষয় এবং উৎস হিসেবে সমান মর্যাদা পাবে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনসংক্রান্ত রিপোর্টে সাংবাদিকরা নারী প্রার্থীদেরকে গতানুগতিক নারীত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন (Colemon & Mayor, 2008)। নারীর পোশাক, বৈবাহিক অবস্থা, মাতৃত্ব, পারিবারিক ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। মোটা দাগে নারীর অবদানের চেয়ে সতীত্ব ও ইমেজ মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এমআরডিআই পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৮ ও ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কাভারেজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো ভূমিকা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রে নারীকে সংবাদের মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরার বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও টেলিভিশনে মুখপাত্রের ভূমিকায় বেশি প্রচারিত হয়েছে। একটি সংবাদের প্রধান বিষয়, মুখপাত্র, বিশেষজ্ঞ ও সাক্ষী হিসেবে নির্বাচনসংক্রান্ত রিপোর্টগুলোতে নারীর উপস্থিতি ছিল হতাশাজনক।

এমআরডিআইয়ের এই গবেষণায় দেখা গেছে, টেলিভিশনের তুলনায় পত্রপত্রিকায় জেন্ডার অসংবেদনশীল রিপোর্ট বেশি এসেছে।

নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্বের চেয়ে পারিবারিক ভূমিকার প্রতি গণমাধ্যমের আগ্রহ থাকে বেশি। অনেক সময় পরোক্ষভাবে এমন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয় যে, পরিবারের দায়িত্ব পালনের পর তিনি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না। যেমন, ২০১৪ সালে হিলারি ক্লিনটনের কন্যা চেলসি ক্লিনটন গর্ভবতী হলে ইউএসএ টুডে নির্বাচনের দুই বছর আগেই প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, *It's unclear how Chelsea's pregnancy will affect Hillary Clinton, who is considering a race for president in 2016.* (Camia, 2014)। অথচ মিট রুমনি (Pow, 2012) বা জর্জ ডব্লিউ বুশ (Muto, 2015) যখন দাদা হওয়ার ছবি সামাজিক গণমাধ্যমে প্রকাশ করে তখন গণমাধ্যম তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না।

নারী প্রার্থীদের সম্পর্কে রিপোর্ট করার সময় গণমাধ্যমের আরেকটি প্রথাগত বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট নারী প্রার্থী কীভাবে মনোনয়ন পেলেন, তিনি কোন কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তির আশীর্বাদপুষ্ট এবং তাঁর নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য তিনি কীভাবে বাবা, স্বামী, শ্বশুর – এঁদের ইমেজ বা সুনামকে ব্যবহার করছেন।

জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিংয়ের জন্য করণীয়

নির্বাচন রিপোর্টিং প্রতি যদি জেন্ডার অসংবেদনশীল হয়, তাহলে এর প্রভাব ভোটারদের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভোটাররা নারী প্রার্থীদের অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য মনে করতে পারে। শুধু লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে রিপোর্ট যাতে কোনোভাবে পক্ষপাত দুষ্ট না হয় সেজন্য একজন সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল নির্বাচনী প্রচারের জন্য গণমাধ্যম/সাংবাদিকদের যা করা দরকার :

১. সমাজে নারী-পুরুষের সম-উপস্থাপনের জন্য নিরপেক্ষ ও ন্যায্যভাবে গণমাধ্যমের সংবাদের উৎস ও প্রকাশিতব্য/প্রচারিতব্য সংবাদ নির্বাচন করে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে রিপোর্টের চেষ্টা থাকতে হবে। গণমাধ্যম/সাংবাদিকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে :

- সংবাদ ও সাম্প্রতিক তথ্যসংবলিত যে-কোনো গণমাধ্যমের আধেয়ে নারী ও পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনা থাকবে;
- সংবাদে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস/সূত্র, মতামত ও বিশেষজ্ঞের মতামত ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনা থাকতে হবে;
- নারীকে শুধু সাধারণ জনগণ বা ভুক্তভোগী হিসেবে সংবাদে উপস্থাপন করা যাবে না। বিশেষজ্ঞ বা পেশাজীবী হিসেবে নারীদের উপস্থাপনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

২. কুসংস্কার পুরোপুরিভাবে দূরীকরণে নারী-পুরুষের চিত্রায়ণ

গণমাধ্যম/সাংবাদিকদের যা করতে হবে :

- সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কার ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে যৌন ব্যাখ্যাসংবলিত তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করা পরিহার করতে হবে;

- নারী ও পুরুষ প্রার্থীকে বিশেষ লিঙ্গপরিচয় ও বৈশিষ্ট্যে আখ্যায়িত করে রিপোর্ট করা যাবে না;
- যে-কোনো লিঙ্গ/জেন্ডারকে হেয় করে এমন ভাষা পরিহার করতে হবে।

৩. লিঙ্গসমতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা ও প্রশ্নবিদ্ধ করা গণমাধ্যম/সাংবাদিকদের যা করতে হবে :

- নির্বাচনে জেন্ডার বা লিঙ্গ ভূমিকা নিশ্চিতকরণে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা যাচাই করুন;
- দেশের যে-কোনো পর্যায়ের নির্বাচনে (জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন) নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সহায়ক, নাকি প্রতিবন্ধক তা পরীক্ষা করুন;
- নারীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এমন বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখুন;
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে কম গুরুত্ব দিয়ে বা অতিরিক্ত স্পর্শকাতরভাবে উপস্থাপন করবেন না;
- প্রত্যেক দলের প্রার্থীদের লিঙ্গভিত্তিক সমতা যাচাই করে দেখুন;
- লিঙ্গভেদে নিবন্ধিত ভোটারসংখ্যা পরীক্ষা করুন এবং কোনো অঞ্চলে ভয়ভীতি ও প্রান্তিক হওয়ার কারণে নারীরা ভোটার হতে পারেনি বা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কি না যাচাই করে দেখুন;
- আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার পর দেখুন কতজন নারী প্রার্থী নির্বাচনে জিতেছেন;
- একটি জেন্ডার/লিঙ্গ-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করুন – কোনো নারী প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী প্রচারকাজে হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন কি না, বা তাঁর নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কি না, পুরুষদের তুলনায় নারীরা এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি বেশি হয়েছেন কি না, নির্বাচনী প্রচারের সময় নারীরা অন্য কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন কি না।

অধ্যায় ১৫

এ অধ্যায়ে থাকছে

নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের জন্য পালনীয় আচরণবিধি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একদিকে ভোটারদের জন্য যেমন একটি উৎসব তেমনি অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি মহাযজ্ঞ। সব পত্রিকা, সম্প্রচার ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম নির্বাচনের খবর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ বা প্রচার করে থাকে। অসাবধানতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, তাড়াহুড়ো, নৈতিকতার মানদণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। কখনও কখনও একপেশে রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। এমআরডিআই কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য, বিশ্বাসযোগ্যতা, যথার্থতা বা নির্ভুলতা, তথ্যের অস্পষ্টতা, উদ্দেশ্যপূর্ণ উত্তেজক শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে আমাদের দেশের পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে নৈতিকতার মানদণ্ডের লঙ্ঘন হয়ে থাকে। এ গবেষণায় ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ছয়টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ৭৯২টি ও ছয়টি টেলিভিশনে প্রচারিত ২৩টি প্রাইম টাইম বুলেটিনের ৫০৪টি খবর বিশ্লেষণ করা হয়। তাতে দেখা গেছে, সংবাদপত্রের ২৩২টি সংবাদ ও টেলিভিশনের ১৮টি সংবাদ নৈতিকতা লঙ্ঘনের দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে আদর্শ সাংবাদিকতার যে মানদণ্ড সেগুলো যথাযথভাবে আমাদের দেশে মানা হয় না। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই বইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিপোর্টিংয়ের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই নীতিমালা স্বতঃসিদ্ধ কোনো বিষয় নয়; এটি আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে। বিশ্বের স্বনামধন্য গণমাধ্যম এবং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে এ নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে। যেসব নীতিমালা পর্যালোচনা করে এই নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি

১। প্রস্তাবনা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক উত্তেজনা পরিহার এবং দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যম) জন্য এই আচরণবিধি প্রযোজ্য হবে। দেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য গণমাধ্যম তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের পরিবেশ তৈরিতে এ আচরণবিধি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নির্বাচনকালে বিভিন্ন দিক থেকে আসা চাপ প্রতিহত করার লক্ষ্যে একজন সাংবাদিককে তাঁর পেশাগত নৈতিক মূলনীতির ওপর তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হয়। তথ্য হবে অবশ্যই নির্ভুল, যাচাইকৃত, ভারসাম্যপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও মানবীয় মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একজন সাংবাদিককে সর্বদা মনে রাখতে হবে তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন। গণমানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় একজন সাংবাদিককে নিম্নলিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

২। আচরণবিধি

ক. গণমাধ্যমের সাধারণ দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় কিংবা বেসরকারি যে-কোনো সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। সংবাদমাধ্যম নির্বাচন সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ও নির্ভুল এবং ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে, যাতে ভোটাররা যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন।

একটি স্থিতিশীল সমাজ ও সাংবাদিকতায় সততা বজায় রাখা

নির্বাচনী কাভারেজের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নির্বাচন-সম্পর্কিত তার কাভারেজ ও রিপোর্টিংয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলবে :

১. সকল দল, প্রার্থী ও ভোটারদের অধিকার সম্পর্কে গণমাধ্যম সজাগ থাকবে। গণমাধ্যমে প্রচারিত নির্বাচনী প্রচারের ইস্যুগুলো অবশ্যই জনগণ এবং দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

২. প্রতিবেদনের নির্ভুলতা ও সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে দুটি নিরপেক্ষ সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। সন্দেহাতীতভাবে তথ্য যাচাইয়ের পর নির্ভুল ও সঠিক তথ্যই উপস্থাপন করতে হবে। জোরপূর্বক কোনো সিদ্ধান্ত রিপোর্টে তুলে ধরা যাবে না।

৩. জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষ, ঘৃণা, পক্ষপাত বা অবমাননামূলক কিংবা এ ধরনের বিদ্বেষ তৈরি করতে পারে, এমন কোনো কিছু কিংবা জনবিশৃঙ্খলা তৈরি বা তৈরিতে সহায়ক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো কিছু প্রকাশ বা প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. প্রতিবেদন তৈরির সময় উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন নেতিবাচক শব্দ ও ছবি যেন বাছাই করা না হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। উত্তেজনা তৈরির উদ্দেশে লোমহর্ষক বর্ণনা বা অপমানকর ভাষাসহ ভিত্তিহীন কোনো প্রকাশনা অগ্রহণযোগ্য।

৫. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল পক্ষের মত তুলতে ধরতে হবে। রিপোর্টে তথ্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে; তবে কখনই ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন তা বলা যাবে না।

৬. বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দল বা তাদের এজেন্টের দেয়া কোনো কিছু প্রকাশ বা প্রচারের আগে সম্পাদনা করতে হবে।

৭. রাজনৈতিক দল বা তাদের এজেন্টের দেয়া কোনো কিছু বিদ্বেষপূর্ণ, অনৈতিক, জনশৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ প্রতীয়মান হলে মান বজায় রাখা ও জননিরাপত্তা এবং শিষ্টতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গণমাধ্যম প্রচলিত আইন পর্যবেক্ষণ ও সম্পাদকীয় নীতির আলোকে তা প্রকাশ বা প্রচার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে। এই ধরনের অস্বীকৃতির সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই প্রচার বা প্রকাশ না হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে অতি দ্রুত অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট

রাজনৈতিক দল বা তাদের এজেন্টকে গ্রহণযোগ্য আইন, নৈতিকতা ও অন্যান্য মানদণ্ডের আলোকে বাতিলকৃত বিষয়গুলো সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে।

৮. সম্পাদকীয় এবং/বা বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ/নিবন্ধ বা মতামত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করতে যে-কোনো ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ শব্দ, বাক্য সব সময় পরিত্যাজ্য।

৯. লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, শ্রেণি, জন্মস্থান, যৌন পরিচয়/অভিযোজন এবং শারীরিক বা মানসিক সক্ষমতাসহ যে-কোনো কিছু বিবেচনায় কারও প্রতি ঠাট্টা, বিদ্রুপ বা পরিহাসমূলক বক্তব্য প্রচার বা প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই শর্তের মধ্যে চিঠিপত্র কলামে বা সরাসরি/রেকর্ডকৃত কোনো অনুষ্ঠানে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাদের জাতিগত ও ধর্মীয় অপব্যবহারের পরিহার অন্তর্ভুক্ত।

১০. গণতান্ত্রিক মুক্ত বক্তৃতা দেয়ার সুযোগে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য ও সহিংসতা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি কমিয়ে আনতে যথাযথ সম্পাদনা, উপস্থাপনা ও সংবাদের মান নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা এবং কৌশলগুলো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

১১. গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগ ও চর্চার ব্যর্থতার দায়ভার গণমাধ্যমকে স্বীকার করে নিতে হবে।

১২. নিজেদেরকে যে-কোনো রাজনৈতিক দল (নিবন্ধনকৃত/অনিবন্ধিত), মতাদর্শ, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতে হবে।

১৩. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কাজ করে এমন কোনো ব্যক্তি, দল বা সংগঠনের আদর্শ, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

পেশাদার সাংবাদিকতা

গণমাধ্যম তাদের মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার চর্চায় ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ সব সময় সচেষ্ট থাকবে :

১. যে-কোনো ঘটনা বা বিষয়ের একটি সত্য, বিস্তৃত, সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা তুলে ধরবে;

২. সহিষ্ণুতার নীতির সমর্থনে ও মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মৌলিকভাবে নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে জনগণের মন্তব্য, মতামত, আলোচনা ও সমালোচনা তুলে ধরার ফোরাম হিসেবে কাজ করবে;

৩. সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠী, দল ও সংগঠনগুলোর একটি সঠিক ও বৈধ চিত্র তুলে ধরতে হবে;

৪. সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গোষ্ঠী, দল ও সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো যতটা সম্ভব উপস্থাপন ও স্পষ্ট করতে হবে;

৫. নির্বাচনী প্রচারকালে প্রতিবেদন করার সময় কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর সরঞ্জামাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে;

৬. কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা প্রার্থীর যে-কোনো ধরনের প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে হবে;

৭. কোনো রাজনৈতিক রিপোর্ট/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্য

গণমাধ্যম সত্য অনুসরণের ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ' প্রতিবেদনের মৌলিক নীতি গ্রহণে স্বীকার করে –

১. ভারসাম্যপূর্ণ কাভারেজ বলতে কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য সমান স্থান ও সময় বরাদ্দ দেয়া বোঝায় না;

২. কোনো সংবাদই নিরপেক্ষ নয়, যদি তা থেকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বাদ দেয়া হয়। যদি তা ঘটে, তাহলে এটি অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচ্য হবে;

৩. কোনো সংবাদই নিরপেক্ষ নয়, যদি তাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অযৌক্তিক তথ্য, গুজব বা অযৌক্তিক মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

৪. কোনো সংবাদই নিরপেক্ষ নয়, যদি তা পাঠক, দর্শক, শ্রোতাকে ভুল পথে পরিচালিত করে বা তাদের সঙ্গে ছলনা করে;

৫. রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দলের প্রতি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, তাহলে সংবাদে ভারসাম্য থাকে না।

যথার্থতা ও সম্পূর্ণতা

গণমাধ্যম নির্বাচনী রিপোর্টের ক্ষেত্রে 'যথার্থতা ও সম্পূর্ণতা' এই দুটি নীতি গ্রহণ করার অর্থ হলো খারাপ সাংবাদিকতা থেকে ভালো সাংবাদিকতা এবং প্রচারণা থেকে সাংবাদিকতা থেকে আলাদা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গণমাধ্যমগুলো স্বীকার করে যে,

১. নির্ভুলতা বা যথার্থতার জন্য সব তথ্যের যাচাই (যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায়ে) ও উপস্থাপন প্রয়োজন, যা কোনো একটি ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং সে ঘটনা বা ইস্যুটি বুঝতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে কোনো তথ্য গণমাধ্যম বা সাংবাদিকের সুনির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাস বা অনুভূতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও তা বিবেচ্য নয়;

২. গণমাধ্যমকে ছোট দলগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি নির্ধারিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা কথা স্বীকার করে নিতে হবে, যাতে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিসরে ভোটদানের বিকল্পগুলো খোলা থাকে;

৩. ভোটাররা যাতে সব দল বা মত সম্পর্কে তথ্য জেনে ভোটদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেজন্য ভারসাম্য বা নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে একটি ঘটনা বা ইস্যু-সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মত বা ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে ওই মত বা ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে সাংবাদিক, প্রতিবেদক, সম্পাদক বা পাঠক/দর্শক-শ্রোতার মতের মিল বা অমিল যা-ই থাকুক না কেন তা বিবেচনা করা যাবে না।

৪. পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের বিভ্রান্তি এড়াতে সংবাদ ও মন্তব্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তুলে ধরতে হবে।

৫. রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো গণমাধ্যমকর্মী তাঁর গণমাধ্যমকে নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। যেহেতু বর্তমানে কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের কোনো গণমাধ্যম মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাসংবলিত কোনো আইন নেই সে কারণে এ ধরনের গণমাধ্যমগুলোকে সংবাদ ও রাজনৈতিক মন্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরতে হবে।

জনমত জরিপের ব্যবহার

১. অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জনমত জরিপ সম্পর্কে সংবাদ করতে হবে;

২. জরিপের দিন-তারিখ, অবস্থান, আর্থিক সহায়তা ও জরিপপদ্ধতি, নমুনাসংখ্যা, জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্ন ও ভুলের পরিমাণ ইত্যাদি সুচারুরূপে যাচাই করে প্রতিবেদন করতে হবে। সংবাদে জরিপের দিন-তারিখ ও শত, কতজনের লোকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে জরিপটি পরিচালিত হয়েছে তা নিয়ে অন্তত পক্ষে একটি অনুচ্ছেদ থাকতে হবে;

৩. স্বনামধন্য জরিপ প্রতিষ্ঠান ছাড়া ভুঁইফোঁড় কোনো প্রতিষ্ঠানের মতামত জরিপ নিয়ে সংবাদ করা যাবে না।

অভিযোগের জবাব

১. গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদন, মন্তব্য বা নিবন্ধের নির্ভুলতা ও যথার্থতা নিয়ে কোনো সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের জবাব গণমাধ্যমকে গুরুত্বের সঙ্গে দিতে হবে। অবশ্য নাম-ঠিকানাবিহীন কোনো অভিযোগের জবাব দিতে গণমাধ্যম বাধ্য নয়।

সংশোধন ও প্রত্যাহার

১. গণমাধ্যমকে দ্রুতগতিতে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভুল সংশোধন করতে হবে; এক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য কোনো গণমাধ্যম সময় বেঁধে দিতে পারে না। যত দিনই লাগুক না কেন তথ্যগত ভুল সংশোধন করে তা প্রকাশ/প্রচার করতে হবে। প্রয়োজন হলে সংবাদটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

প্রচার নিষিদ্ধ সময়ে কাভারেজ

১. নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা পর্যন্ত কোনো ধরনের নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রম গণমাধ্যমের সাহায্যে করা যাবে না।

২. নির্বাচন কমিশন, সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট যথাযথ কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ আইনসম্মতভাবে কোনো সংবাদ বা তথ্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা মেনে চলতে হবে।

ভোটের দিন

১. ভোটের দিন কোনো ধরনের প্রচারমূলক সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা যাবে না;

২. ভোটের দিন মূল ধারার গণমাধ্যমের সামাজিক গণমাধ্যম অ্যাকাউন্টে তথ্য পরিবেশনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

৩. ভোটের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ভোটের দিন কোনো ধরনের জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না।

রিপোর্টারদের জন্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সহায়তা

সাংবাদিকদের আত্মনির্ভরশীলতা ও সততার জন্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সহায়তার প্রয়োজনীয়তা গণমাধ্যম স্বীকার করে –

নির্ভুল বা বিকৃতিহীন তথ্য উপস্থাপন, পক্ষপাতহীন রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা যেসব বাহ্যিক চাপের সম্মুখীন হন সেগুলো মোকাবিলার জন্য গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক ও সম্পাদকগণ সাংবাদিকদের সহায়তা করতে সম্মত থাকবেন।

খ) সাংবাদিকদের দায়িত্ব

নির্ভুলতা ও যথার্থতা

১. যে-কোনো সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক সর্বদা নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করবেন; যে-কোনো ধরনের ভুল দ্রুতগতিতে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সংশোধন করবেন;

২. প্রত্যেক সাংবাদিককে অবশ্যই উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য সহকারে রিপোর্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট বাছাইকৃত উপকরণ ব্যবহার বা ইচ্ছাকৃত তথ্য গোপন করতে পারবেন না;

৩. প্রত্যেক সাংবাদিককে অবশ্যই তথ্য ও মতামতের পার্থক্য জানতে হবে এবং কোনো গুজবকে তথ্য হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন না;

৪. প্রত্যেক সাংবাদিককে তথ্য যাচাইয়ের সর্বোচ্চ মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে;

৫. শিরোনাম ও সংবাদ সূচনা অবশ্যই সংবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং পটভূমিমূলক তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে;

৬. প্রত্যেকটি সংবাদে অবশ্যই নির্ভুলভাবে, পূর্ণাঙ্গভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সূত্রের উল্লেখ থাকবে। যখন অন্য কোনো উপায় থাকবে না কিংবা সূত্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তখনই কেবল অজ্ঞাত সূত্র উল্লেখ করা যাবে;

৭. সংবাদে উল্লিখিত তারিখ, দিবস ও স্থানের নাম (ডেটলাইন) অবশ্যই নির্ভুল ও যথাযথ হবে। বাইলাইন স্টোরি এবং প্যাকেজ রিপোর্টের ক্ষেত্রে রিপোর্টার যে স্থান থেকে রিপোর্ট করছেন তার উল্লেখ থাকতে হবে;

৮. কোনো ধরনের বিকৃতি বা অতিরঞ্জনের জন্য শব্দ ও ভিডিও সম্পাদনা করতে পারবেন না;

৯. কোনো ঘটনা বা ইস্যুর সঙ্গে সকল পক্ষের মতামত তুলে ধরতে সক্ষম এমনভাবে ভক্সপপ তুলে ধরতে হবে;

১০. গ্রাফিক্সে ব্যবহৃত তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই করতে হবে। যদি কোনো গ্রাফিক্সে সাংঘর্ষিক বা বিতর্কিত কোনো তথ্য থাকে, তাহলে তথ্যের সূত্র উল্লেখ করতে হবে; যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্যাখ্যাও দিতে হবে;

১১. অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গুজবের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো সত্য, নির্ভুল ও যাচাইকৃত সংবাদ পরিবেশন করা;

১২. কোনো সংবাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হলে কোনো ভোটার, প্রার্থী কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির জাতি, ধর্ম ও যৌন পরিচয় সুনির্দিষ্ট করে লেখা যাবে না। তবে ব্যক্তির জাতীয়তা, বয়স ও পেশার কথা উল্লেখ করা যাবে। কোনো ব্যক্তির চেহারা বা শারীরিক গঠনের বর্ণনা দেয়া যাবে কিন্তু প্রচলিত ছাঁচবদ্ধ বর্ণনা যেমন 'মোটা', 'সুন্দরী', 'বীর' বা 'যৌন আবেদনময়ী' ইত্যাদি লেখা যাবে না।

ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা

১. প্রত্যেক সাংবাদিককে অবশ্যই ঘটনা/বিষয়/ইস্যুর সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের ভাষ্য/মতামত/প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত সকল পক্ষের মতামত অবশ্যই সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে;

২. ব্রেকিং নিউজ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে মতামত দেয়ার জন্য যৌক্তিক সময় দিতে হবে। একটি ফোন কল বা একটি ইমেইল মতামত সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত নয়। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তা প্রথম সংবাদে উল্লেখ করতে

হবে। এক্ষেত্রে মতামত নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মতামত পাওয়ার পর সংবাদের আপডেট প্রকাশ/প্রচার করতে হবে;

৩. কোনো ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য, মানহানিকর মন্তব্য ও সংঘর্ষ বা মিথ্যা প্ররোচণা উদ্রেককারী কোনো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না;

৪. পটভূমিমূলক তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন কোনো উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাবে না, যা প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক;

৫. কোনো রিপোর্টারের রাজনৈতিক মতামত তাঁর কাজকে প্রভাবিত করতে পারবে না;

৬. যেসব প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার রিপোর্টার কাভার করবেন সেসব প্রার্থীর কাছ থেকে একটি পেশাদার দূরত্ব রক্ষা করে চলবেন এবং কোনো প্রার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করা যাবে না;

৭. কোনো রিপোর্টার কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর দলের কিংবা প্রচার দলের কারও কাছ থেকে কোনো উপহার, সাহায্য, আনুকূল্য বা সেবা নিতে পারবেন না। যদি কোনো রাজনৈতিক প্রচার কাভারেজের জন্য ভ্রমণ করতে হয়, তাহলে নিজস্ব ব্যয়ে করতে হবে এবং কারও আতিথ্য গ্রহণ করা যাবে না;

৮. প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের মনে এই ধারণা দেয়া যাবে না যে, তাদের প্রচারের কাভারেজ অবশ্যই দেয়া হবে; সংবাদ মূল্য অনুযায়ী প্রচার কাভারেজ দিতে হবে;

৯. যখন কোনো প্রার্থী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক, যৌন আপত্তিকর, বর্ণবাদী কিংবা অন্য কোনো ধরনের অপমানজনক বা মানহানিকর কিছু বলে থাকেন তখন সাংবাদিককে অবশ্যই তার প্রতি সচেতন হতে হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি রিপোর্টে তুলে ধরা যাবে, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বক্তব্য অবশ্যই নিতে হবে।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

১. প্রত্যেক সাংবাদিককে দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে;

২. কোনো সাংবাদিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো ধরনের অসুদপায়, যেমন—চুরি, পাসওয়ার্ড চুরি, হ্যাকিং বা ইলেকট্রনিক নজরদারির আশ্রয় নিতে পারবেন না।

সূত্রের সুরক্ষা

১. গোপনীয় সূত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব এবং জ্ঞাতসারে কোনো সোর্সকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না;

২. ডিজিটাল সার্ভিলেন্স (নজরদারি) এখন একটি স্বাভাবিক প্রবণতা; কর্মক্ষেত্রে সূত্রের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য স্পর্শকাতর বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

উদ্ধৃতির ব্যবহার

১. উদ্ধৃতি বা মন্তব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংবাদিককে অবশ্যই নির্ভুলভাবে সূত্রের পরিচিতি তুলে ধরতে হবে;

২. বক্তা যা বলেছেন তার কোনো বিকৃতি করা যাবে না অথবা এমনভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরা যাবে না, যাতে তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে বা অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়; প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের নেতারা যা বলবেন তাই উদ্ধৃতিতে তুলে ধরতে হবে, তবে কোনো ভুল বা সাংঘর্ষিক কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে নির্ভুল তথ্যটিই প্রকাশ/প্রচার করতে হবে।

৩. উদ্ধৃতি বা মন্তব্যের ব্যাকরণ ও ভাষাগত ভুল সংশোধন করা সাংবাদিকের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে কোনো উদ্ধৃতির অংশবিশেষ ও সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যাবে, যদিও কোনো পাবলিক ফিগারের ভুলে ভরা কোনো বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা আইনসম্মত।

৪. শব্দ, বাক্য কিংবা ভিডিও সম্পাদনার মাধ্যমে একটি উদ্ধৃতির অর্থের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না;

৫. যদি কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহলে কোথায় এবং কীভাবে এই উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক

১. নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর সঙ্গে যদি কোনো রিপোর্টারের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে, তাহলে তা অফিস বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে;

২. নির্বাচনী প্রচার কাভারেজ করতে গিয়ে কোনো রিপোর্টার তার সঙ্গে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্ক আছে এমন কারও মন্তব্য, ছবি, ভিডিও ধারণ করবেন না।

সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার

১. কোনো সাংবাদিক কোনো ব্রেকিং নিউজ তার নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রচার বা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের সামাজিক মাধ্যমের ওয়ালে পোস্ট দিতে পারবেন না;

২. কোনো সাংবাদিক তাঁর নিজের কিংবা অফিসের সামাজিক মাধ্যমের ওয়ালে কোনো গুজব বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করবেন না;

৩. একান্ত কোনো ব্যক্তিগত তথ্য পরিবেশন করতে হলে এটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মত বলে উল্লেখ করে দিতে হবে এবং বলতে হবে এক্ষেত্রে তাঁর অফিসের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

চৌর্যবৃত্তি

১. অন্যের কোনো কাজকে নিজের বলে কোনো সাংবাদিক চালিয়ে দেবেন না;

২. অন্য যে-কোনো উৎস থেকে কোনো কিছু কপি করলে সে সূত্র অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং ক্রেডিট দিতে হবে;

৩. কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন করা যাবে না।

নির্দোষ অনুমান

১. প্রত্যেক সাংবাদিককে নির্দোষ অনুমানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং কোনো ব্যক্তি আটক বা গ্রেপ্তার হলেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

Ahmed, Niaz. "Bangladesh." In *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia*, edited by Dieter Nohlen, Florian Grotz and Christof Hartmann. London: Oxford University Press, 2001.

Akash, M. M. "Election Manifestos." In *The Reporter's Guide: Handbook on Election Reporting*, edited by Q. A. Tahmina Philip Gain and Shishir Moral, 125-145. Dhaka: Society for Environment and Human Development (SHED), 2006.

Alam, Md. Habibul. *Is fake news rising in our media?* July 16, 2018. http://www.thefinancialexpress.com.bd/views/is-fake-news-rising-in-our-media-1531728516 (accessed September 03, 2018).

Anglin, D. "International election monitoring: the African experience." *African Affairs* 97, no. 389 (1998): 471–495.

Arman, Tanbir Uddin. *Press freedom report: media self-censorship on rise in Bangladesh.* April 25, 2018. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2018/04/25/press-freedom-report-bangladesh-shows-no-progress (accessed August 24, 2018).

Barraquand, Hervé, Martine Anstett, Christophe Deloire, and Ambroise Pierre. *Handbook for Journalists During Election.* Paris: International Organization of La Francophonie; Reporters Without Borders, 2013.

bdnews24.com. রম্যের ফাঁদে সুবোধ সাংবাদিকতা, November 03, 2017. https://bangla.bdnews24.com/media_bn/article1416617.bdnews (accessed September 09, 2018).

Berg, Anne-Catherine, and Radka Betcheva. *EBU Principles for Election Coverage in New and Developing Democracies.* Geneva: European Broadcasting Union, 2014.

Blake, Aron. *A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election.* April 03, 2018. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/?utm_term=.cc21975da7af (accessed September 04, 2018).

BNNRC. *Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication.* 2018. http://bnnrc.net/about-community-radio/ (accessed August 24, 2018).

Boyd, Andrew. *Broadcast Journalism: Techniques of Radio & Television News.* 5th. London: Focal Press, 2001.

Brandt, Torben, et al. *Coaching Manual for Media Support during Elections.* First. International Media Support; Media & Democracy Group; Réseau Liberté, 2006.

Bucy, Erik P. "Emotional and evaluative consequences of inappropriate leader displays." *Communication Research* 27, no. 2 (2000): 194–226.

Camia, Catalina. *Baby on board: Chelsea Clinton says she's pregnant.* April 1, 2014. https://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/04/17/chelsea-clinton-pregnant/7836283/ (accessed September 09, 2018).

CNBC. *Read all about it the biggest fake news stories of 2016.* December 30, 2016. https://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-about-it-the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html (accessed September 06, 2018).

Colemon, R., and L. H. Mayor. "The Intersection of Race and Gender in Election Coverage: What Happen When the Candidates don't Fit the Stereotypes?" *Howard Journal of Communication* 19, no. 4 (2008): 315-333.

Coronel, Sheila S. *Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans.* Sarajevo: BIRN, 2009.

Department of Films & Publications. *Department of Films & Publications.* August 01, 2018. http://www.dfp.gov.bd/site/page/6469f3ce-a47b-453f-84e6-c60e3732bae5/%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0% A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E (accessed August 24, 2018).

Dhar, Subrata Shankar. "Things Deserving More Coverage in the Election." In *The Reporter's Guide: Handbook on Election Reporting*, edited by Philip Gain, Q. A. Tahmina and Shishir Moral, 94-105. Dhaka: Society for Environment and Human Development (SHED), 2006.

Dondis, A. *A primer of visual literacy.* Cambridge: The MIT Press, 1973.

DW. ভুয়া খবর যেভাবে তৈরি হয় ও ছড়ায়, January 06, 2017. https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%93-%E0%A6%9B%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A7%9F/a- (accessed September 09, 2018).

—. বাংলাদেশঃ ভুয়া খবরে আসল পত্রিকা, October 18, 2017. https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE/a-41015116 (accessed September 09, 2018).

Earl, Jennifer. *Google's top search result for "final election numbers" leads to fake news site.* November 14, 2016. https://www.cbsnews.com/news/googles-top-search-result-for-final-election-numbers-leads-to-fake-news-site/ (accessed September 06, 2018).

Ellis, J. *Television and common knowledge.* Vol. 30. New York, NY: Routledge, 1999.

Firoj, Jalal. "Forty Years of Bangladesh Parliament: Trends, Achievements, and Challenges." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* 58, no. 1 (2013): 83-128.

Gain, Philip. "General Elections in Bangladesh." In *The Reporter's Guide: Handbook on Election Reporting*, edited by Philip Gain, 167-206. Dhaka: Society for Environment and Human Development (SHED), 2006.

Gamson, William A. "News as framing: Commenting on Graber." *American Behavioral Scientist* 33, no. 2 (1989): 157–161.

Gawiser, S. R., and G. Evans Witt. "20 Questions a Journalist Should Ask about Poll Results." In *Covering Polls: A Handbook for Journalists*, edited by Larry McGill, 2-10. San Francisco: Media Studies Center, 2000.

Grabe, Maria Elizabeth, and Erik Page Bucy. *Image Bite Politics: News and the Visual Framing of Elections.* New York: Oxford University Press, 2009.

Grant, Lennox, and Wesley Gibbings, *An Election Handbook for Caribbean Journalists.* St. Augustine, Trinidad and Tobago: Association of Caribbean MediaWorkers, 2009.

Gunter, Barry. *Poor reception: Misunderstanding and forgetting broadcast news.* Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1987.

Hansen, Henrik Keith, and Abukar Albadri. *Guidelines for Professional Election Reporting.* Nairobi: IMS: International Media Support; Fojo: Media Institute, 2016.

Hanson, Nils, and Mark Lee Hunter. "Using Human Sources." In *Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists*, by Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan and Pia Thordsen, 37-52. Paris: UNESCO, 2011.

Harcup, Tony. *Journalism: Principles and Practices.* 2nd. New Delhi: Vistaar Publication, 2005.

Hermida, A. "Tweets and truth." *Journalism Practice* 6, no. 5-6 (2012): 659-668.

Howard, Ross. *Media and Elections: An Elections Reporting Handbook.* Vancouver: IMPACS – Institute for Media, Policy and Civil Society, 2004.

Joseph, Ammu. "Responding to Voters." In *Media and Elections: A Handbook*, by Ammu Joseph. AIBD-Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, 2011.

Keeble, Richard. *The Newspapers Handbook.* 4th. New York: Routledge, 2006.

Kepplinger, H. "Visual biases in television campaign coverage." *Communication Research* 9 (1982): 432-446.

Mandell, L., and D. Shaw. "Judging people in the news-unconsciously: effects of camera angle and bodily activity." *Journal of Broadcasting* 17 (1973): 353-365.

Marthoz, Jean Paul, and Aidan White. "Tips for editors and reporters to stay on top of the 24/7 newsroom." In *Covering elections: Media making their mark at election time*, by Bettina Peters, 4-15. Thomson Foundation, 2013.

Mayo, Justin, and Glenn Leshner. "Assessing the credibility of computer-assisted reporting." *Newspaper Research Journal* 21, no. 4 (2000).

McNair, B. *An Introduction to Political Communication.* 4th. London: Routledge, 2007.

Metzler, Ken. *Creative Interviewing: The Writer's Guide to Gathering Information by Asking Questions.* 3rd. USA: Allyn & Bacon, 1999.

Ministry of Information. *Ministry of Information, Bangladesh.* August 1, 2018. http://old.moi.gov.bd/TV/List_of_channels.pdf (accessed August 24, 2018).

Muto, Jordan. *George W. Bush shares adorable photo of meeting his new granddaughter.* August 15, 2015. https://www.today.com/news/george-w-bush-shares-adorable-photo-meeting-his-granddaughter-photo-t38936 (accessed September 09, 2018).

Newhagen, John E., and Byron Reeves. "The evening's bad news: Effects of compelling negative television news images on memory." *Journal of Communication* 42, no. 2 (1992): 25–41.

O'Neill, D., and C. O'Connor. "The passive journalist: How sources dominate local news." *Journalism Practice* 2, no. 3 (2008): 487-500.

Parkinson, Hannah Jane. *Click and elect: how fake news helped Donald Trump win a real election.* November 14, 2016. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/fake-news-donald-trump-election-alt-right-social-media-tech-companies (accessed September 05, 2018).

Pow, Helen. *Twin boys bring Mitt Romney's brood of grandchildren to 18 (but Mormons aren't happy about the surrogate birth).* May 5, 2012. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2139814/Twin-boys-bring-Mitt-Romneys-brood-grandchildren-18-Mormons-arent-happy-surrogate-birth.html (accessed September 09, 2018).

Powell, B. *Elections as instruments of democracy.* New Haven: Yale University Press, 2000.

Rao, B. V. "Planning Election Coverage." In *Media and Elections A Handbook*, by Ammu Joseph. AIBD- Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, 2011.

Read, Max. *Donald Trump Won Because of Facebook*. November 09, 2016. http://nymag.com/selectall/2016/11/donald-trump-won-because-of-facebook.html (accessed September 05, 2018).

Samad, Ataus. "Important Sources of Election Reporting." In *The Reporter's Guide: Handbook on Election Reporting*, edited by Philip Gain, Q. A. Tahmina and Shirshir Moral, 01-18. Dhaka: Society for Environment and Human Development, 2006.

Sherwood, Huge C. *The Journalistic Interview.* 1st. New York: Haroer & Raw Publishers, 1969.

Sigal, V. Leon. "Sources make the News." In *Reading the News*, edited by Robert K. Manoff and Michael Schudson, 9-37. New York: Pantheon, 1986.

Sullivan, Dennis G., and Roger D. Masters. "Happy warriors": Leaders' facial displays, viewers' emotions, and political support." *American Journal of Political Science* 32, no. 2 (1988): 345–368.

Swanson, David L. "The political-media complex." *Communication Monographs* 59 (1992): 397–400.

Temenugova, Aleksandra, Vesna Sopar, Zoran Dimitrovski, and Sefer Tahiri. *Guidelines on Ethical Journalism and Quality Reporting*. Verein freies radio Wien, 2013.

The Editor. *What is Objective Journalism?* March 21, 2017. http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2017/842-what-is-objective-journalism.html (accessed September 05, 2018).

The New Indian Express. *60 percent of PM Narendra Modi's Twitter followers are fake: Twiplomacy.* March 14, 2018. http://www.newindianexpress.com/nation/2018/mar/14/60-per-cent-of-pm-narendra-modis-twitter-followers-are-fake-twiplomacy-1786939.html (accessed September 05, 2018).

Uberti, David. *The Real History of Fake News.* December 15, 2016. https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php (accessed September 05, 2018).

Wang, Amy B. *'Post-truth' named 2016 word of the year by Oxford Dictionaries.* November 16, 2016. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/16/post-truth-named-2016-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries/?utm_term=.40bcd3e00b60 (accessed September 05, 2018).

Williams, Paul N. *Investigative Reporting and Editing.* New Jersey: PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, 1978.

Yates, Ronald. "Journalistic Method: Observation Techniques for Authors (Part 1)." May 24, 2017. https://ronaldyatesbooks.com/2017/05/journalistic-method-a-technique-for-authors-part-1-2/ (accessed October 01, 2018).

আমিন, প্রভাষ (২০১৩) ইলেকট্রনিক মিডিয়া : সবার আগে সংবাদ নাকি সবার আগে 'সঠিক' সংবাদ?, নিরীক্ষা, ১৯৮তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী, পৃ. ৩০-৩২।

আহমদ, বুরহান উদ্দিন (২০০৮), বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনী আইনের বিশ্লেষণ, ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), সাংবাদিক সহায়িকা তথ্যপঞ্জি: নির্বাচনী রিপোর্টিং, তৃতীয় সংস্করণ, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

চৌধুরী, মিরাজ আহমেদ (২০১৫) রিপোর্টিং বই : সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনা, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), ঢাকা।

ফেরদৌস, রোবায়েত; চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং হক, সাইফুল (২০১৫) দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ঢাকা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (২০১৮) ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া, পাওয়া গেছে http://www.ecs.gov.bd/page/registration-process তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১৮।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (২০১৮-ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, পাওয়া গেছে http://www.ecs.gov.bd/page/political-parties তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১৮।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন : অর্গানোগ্রাম (২০১৮) পাওয়া গেছে http://www. ecs.gov.bd/page/organogram তারিখ ২৫ অক্টোবর, ২০১৮।

বাংলাদেশ প্রতিদিন (১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮) নতুন ভোটার তালিকা, পাওয়া গেছে http://www.bd-pratidin.com/editorial/2018/02/01/302500 তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১৮।

সংযোজনী-১

যেসব গণমাধ্যম নীতিমালা ও নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের নির্দেশনা পর্যালোচনা করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন রিপোর্টিংয়ের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. BBC Editorial Guidelines - https://www.bbc.co.uk/ editorialguidelines/news/Election-Guidelines.

২. AFP Editorial Standard and Best Practices - https://www.afp.com/communication/chartes/12_april_2016_afp_ethic_final.pdf

৩. Code of Conduct: United Kingdom - http://ethicnet.uta.fi/united_kingdom/code_of_conduct

৪. Editors' Code of Practice: United Kingdom - http://ethicnet.uta.fi/united_kingdom/editors039_code_of_practice

৫. Declaration of the Duties and Rights of a Journalist: Switzerland - http://ethicnet.uta.fi/switzerland/declaration_of_the_duties_and_rights_of_a_journalist

৬. Code of Ethics for the Press, Radio and Television: Sweden - http://ethicnet.uta.fi/sweden/code_of_ethics_for_the_press_radio_and_television

৭. Code of Ethics for the Norwegian Press - http://ethicnet.uta.fi/norway/code_of_ethics_of_the_norwegian_press

৮. Charter of Duties of Journalists: Italy - http://ethicnet.uta.fi/norway/code_of_ethics_of_the_norwegian_press

৯. Rules of Ethics in Journalism: Iceland - http://ethicnet.uta.fi/iceland/rules_of_ethics_in_journalism

১০. Guidelines for Journalists: Finland - http://ethicnet.uta.fi/iceland/rules_of_ethics_in_journalism

১১. The National Code of Conduct: Denmark - http://ethicnet.uta.fi/denmark/the_national_code_of_conduct

১২. Codes of Conduct for Media in Election: The Electoral Knowledge Network - https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mef/mef03/mef03a00

“

এই বইয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের করণীয়গুলো তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উদাহরণের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। মানসম্পন্ন ও ভালো সাংবাদিকতার সঙ্গে মানহীন সাংবাদিকতার পার্থক্য এসব উদাহরণ থেকে সহজে বোঝা যায়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট আইনগুলো নিয়ে বইটিতে সহজ ও সাবলীলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে শুধু সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীরা নন, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট যে-কেউ এ বই পড়ে উপকৃত হবেন।

”

জেসমিন টুলী
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ

ISBN 978-984-34-5451-5
9 789843 454515 >

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একদিকে ভোটারদের জন্য যেমন একটি উৎসব তেমনি অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি মহাযজ্ঞ। সব পত্রিকা, সম্প্রচার ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম নির্বাচনের খবর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ বা প্রচার করে থাকে। অসাবধানতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, তাড়াহুড়ো, নৈতিকতার মানদণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে নির্বাচনী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। কখনও কখনও একপেশে রিপোর্টও প্রকাশিত হয়।